ভক্তিসাধন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২।

মূল্য ৮০ আনা।

ভূমিকা।
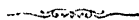
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির মধ্যে যথাসাধ্য অসাম্প্রদায়িক ভাবে ভক্তিপথ ও ভক্তিসাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদি আমার বিশ্বাসের সহিত সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে কাহারও মত বিভিন্নতা হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে, মতের পার্থক্য হেতু যেন ঐকান্তিক বৈরাগ্য বা বৈমুখ্যভাজন না হই। মতবিভিন্নতা জাতীয় জীবন ও স্বতন্ত্র তত্ত্বানুশীলনের লক্ষণ। গতানুগতিকো ন মহার্ঘঃ। অপরের বিশ্বাসের প্রতি আদর প্রদর্শন মহানুভাবতার পরিচয়, এবং আশা করি এই গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পাঠক সেই মনঃস্বিতার পরিচয় দিবেন। ভক্তিপথ সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে সকল কথা লেখা অসম্ভব, সেই হেতু পাঠকগণের মধ্যে যাহারা নারদপঞ্চরাত্র, নারদসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ পাঠ করেন নাই তাঁহাদিগকে ঐ গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এই গ্রন্থে অনেক স্থানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এবং অপর অনেক স্থলে শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষ্যানুমোদিত ভাষার্থ মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর রচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের মহানুভাব জয়গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক অনুবাদ খানি যথাসময়ে প্রকাশ না করিলে আমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া ও প্রুফ সংশোধন করিয়া না দিলে আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে অক্ষম হইতাম, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী রহিলাম। তিনি এই গ্রন্থখানিকে যেমন প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন আশা করি পাঠকগণও গ্রন্থখানিকে সেই চক্ষে দেখিবেন।—

কলিকাতা,
হাতীবাগান
৭৭ নং গ্রে ষ্ট্রীট।
৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সাল।

নিবেদনমিতি
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়স্য।
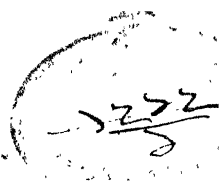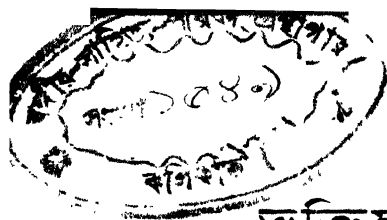
ভক্তিসাধন।

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদোবদন্তি
পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতে কারণমীশ্বরং বা
তস্মৈ নমো বিঘ্ন বিনাশনায়।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভগবানকে পিতা ও মাতা ভাবে উপাসনা করিবার বিধি প্রচলিত আছে। ভারতীয় সগুণোপাসনা বা ভক্তিমার্গ আধুনিক নয়, মহাভারত প্রণয়নের অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে এমন কি ঋগ্বেদের সময় হইতে অভিগমন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশে অপরাপর ধর্ম্মমধ্যেও ভগবানকে পিতারূপে বা মাতারূপে উপাসনা করিবার বিধি আছে বটে, কিন্তু ভগবানকে মাতৃভাবে পূজা করা বা তাঁহার প্রতি মাধুর্য্য ভাব ভারতবর্ষেরই নিজস্ব। ভগবানকে হৃদয় মধ্যে উপাসনা করা শাণ্ডিল্যবিদ্যার বিশেষত্ব এবং অগ্নিরহস্যব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা ভক্তি শাস্ত্রের অন্যতম আকর। গীতা ও ভারতস্থ নারায়ণীয় অধ্যায়কে আধুনিক ও খৃষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর তদানুকূল্যে সংকলিত বলিয়া পরিত্যাগ করিলেও ভারতে প্রচলিত ভক্তিসাধন বা ঐকান্তিক ধর্ম্ম যে অনেক পুরাতন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উপনিষৎ ও অন্যান্য প্রাচীন

গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বস্থ নারদের শ্বেত-দ্বীপ গমনের উপাখ্যান ও নারদপঞ্চরাত্রে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত উপাখ্যানের উল্লেখ থাকাতে অনেক প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে ভারতীয় ভক্তিমার্গ খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে সম্ভূত। তাঁহারা অনেকে বলিতে চান যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা খৃষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর খৃষ্টীয় ভক্তিসাধনের আনুকূল্যে প্রণীত ও প্রকাশিত। পাশ্চাত্য-গণের উল্লিখিত ভ্রমপূর্ণ ধারণার সম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বক ভারতীয় ভক্তিসাধনের নিরপেক্ষত্ব ও প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়! ভক্তিমার্গ প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক উহাই শ্রেষ্ঠ পথ উহাই আশ্রয়।

গীতার নবম অধ্যায়ের একত্রিংশত্তম শ্লোকে ভগবান অভয় প্রদান করিলেন, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। এই আশ্বাস বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া মহর্ষিগণ ভক্তিসাধন সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিজিজ্ঞাসাই প্রধান কর্ত্তব্য বোধে ভক্তি কাহাকে কহে, ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ কি, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে ভেদাভেদবাদী মহাত্মা শাণ্ডিল্যসূত্রপ্রণেতা গ্রন্থের দ্বিতীয় সূত্রে কহিলেন, "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ভগবানে ঐকান্তিক অনুরক্তিই ভক্তি। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানই অনুরক্তি। "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যস্য সাধনম্"। নারদসূত্রে ভক্তিকে ভগবানের প্রতি প্রেম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা অমৃতরূপা যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধোভবতি, অমৃতোভবতি, তৃপ্তোভবতি, যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি, স তরতি স তরতি, সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ"। মহাত্মা নারদ একাদশ প্রকারের ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়াসক্তি, পরম বিরহাসক্তি। প্রসঙ্গক্রমে এই প্রবন্ধ মধ্যে উল্লিখিত কয় প্রকারের ভক্তির বিষয় বর্ণনা করিব।

মহর্ষি কপিলাদি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সাংখ্যমতে আত্মার বন্ধন বাস্তব নয়, অবিবেক হেতুই আত্মাকে বদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং অবিবেক নাশে সংসার শান্তি হইবে ও আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ হইবে। নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মার বন্ধন নাই, প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। "সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।" ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্যদর্শন। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবাকুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণ বিশিষ্ট হয় সেইরূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হওয়ায় পুরুষকে ত্রিগুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। প্রকৃতি পুরুষ বিবেক দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নিত্যবুদ্ধ চেতন, বন্ধ বা সংসৃতি বা মোক্ষ ইহার ধর্ম্ম নহে, এই জ্ঞান জন্মিলে অবিবেক দূর হয়। অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাব উৎপন্ন হইলে প্রপঞ্চ দূরীভূত হয় অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা তাপত্রয় নিঃশেষে নিবারিত হয়।

"নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্ত্যৈ
বিনাস্বতত্ত্বাবগমং সুসূক্ষ্মম্।"

অতিসূক্ষ্মপ্রক্রিয়াসাধ্য আত্মজ্ঞান ব্যতীত ভববন্ধনমোচনের আর কোন উপায় নাই। "ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।" ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে অভিন্নবুদ্ধিই সংসার মুক্তির উপায়। অপর পক্ষে

ভক্তি পথাবলম্বীদের মতে ভগবানে অহৈতুকী অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

গীতা ১৪।২৬

ভাগবতে কথিত আছে,

সংসারসিন্ধুমতি দুস্তর মুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসোভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ১২।৪।৪০

বিবিধ প্রকারের দুঃখ দ্বারা মুহ্যমান পুরুষের অতি দুস্তর সংসার সিন্ধু পার হইবার জন্য ভগবান পুরুষোত্তমের লীলাকথারস অন্তরের সহিত নিষেবন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

গীতাতে উক্ত আছে,

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব। ১১।৫৫

যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ঈশ্বরার্থই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সকল কার্য্যেই যিনি ভগবানকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন, যিনি ভগবৎকীর্ত্তন, স্তুতি ধ্যানার্চ্চন প্রণামাদি ব্যতীত জীবন ধারণ করাকে কষ্টকর মনে করেন, যিনি ভগবানকেই একমাত্র প্রিয় মনে করিয়া অপর সঙ্গ অসহ্য মনে করেন, যিনি ভগবানের সহিত বিয়োগই দুঃখের একমাত্র কারণ ও সংযোগই সুখের একমাত্র কারণ বিবেচনা করেন ও

সেই হেতু সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর তিনিই ভগবানকে অনুভব করেন। শ্রীভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মহাত্মা রামানুজস্বামী বলিয়াছেন যে কেবল মাত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্বরিজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। মহাত্মা স্বপ্নেশ্বরও আরও স্পষ্ট ও প্রবলভাবে ঐ কথাই বলিয়াছেন. তাঁহার মতে সংসার নিবৃত্তির জন্য কোন অলৌকিক সাহায্যের প্রয়োজন এবং তাহাই ভক্তি।

যোগমতে অষ্টাঙ্গ সাধন বা বৈরাগ্য বা অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিলে মানব নিরালম্ব হয়, তখন বিমল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায়, সুতরাং যোগমতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই সংসার নিবৃত্তির উপায়, অতএব মুমুক্ষুর পক্ষে রাগ বা অনুরাগ হেয় ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু ভক্তিপথে অনুরাগই সংসারের সকল প্রকার ক্লেশ নিবারক, অনুরাগই প্রধান অবলম্বন, অনুরাগই উপায় ও পথ। প্রবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির নিরোধই ভক্তি পথের মূল সূত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে "পণ্ডিতেরা বলেন যে আসক্তি আত্মার অক্ষয়পাশস্বরূপ তাহাই আবার সাধু পুরুষে বিহিত হইলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইয়া থাকে।" ৩।৫।২৭। পাছে ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ মুমুক্ষুর অনুচিত ও প্রতিবন্ধক এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় সেই কারণে শাণ্ডিল্য সূত্রকার সূত্রে লিখিয়াছেন "হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ।" ২১। পূজ্যপাদ স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য টীকাতে লিখিয়াছেন "সঙ্গ মাত্রেই যেমন হেয় নহে অসৎ সঙ্গই হেয় সেইরূপ অনুরাগ মাত্রেই হেয় নহে, সংসারানুবন্ধী অনুরাগই হেয়।" যে স্নেহ মমতা অনুরাগ পার্থিব নশ্বর পদার্থের উপর ন্যস্ত থাকাতে মানবের জীবনে এত জ্বালা যন্ত্রণা, মানব জীবন এত কষ্টকর, সেই স্নেহ মমতা অনুরাগ অবিনশ্বর

পদার্থের উপর সংন্যস্ত করিলে মানব জীবনে অতুল ভূমানন্দ ভোগ করেন। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" সেই ভূমা স্বরূপ ভগবানকে ভাল বাসিলেই সুখ তাহা অপেক্ষা অল্প কিছুতে সুখ নাই। মানবের প্রবৃত্তি যতদিন না পর্য্যন্ত ভগবন্মুখী হয় ততদিন তাহার হৃদয়ে অশান্তি, কিন্তু যখনি সেই অনুরাগস্রোতের গতি বদলাইয়া ভগবন্মুখী করা হয় তখন তাহার হৃদয় আনন্দময় ও শান্তিপূর্ণ। মানবের বৃত্তিগুলিকে ভগবন্মুখী করাই ভক্তিমার্গ. প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তি জয় করাই ভক্তিমার্গের বিশেষত্ব। অপর পথাবলম্বী মহাত্মা বলিবেন "তোমার হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসাই তোমার বন্ধনের নিগড়, সেই শৃঙ্খলগুলি বলপূর্ব্বক কিম্বা অভ্যাসের দ্বারা কিম্বা জ্ঞান বা বৈরাগ্যের সাহায্যে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, প্রাণে শান্তি পাইবে।" ভক্ত প্রেমিক বলিবেন 'মানুষকে পার্থিব বস্তুকে ভালবাসিয়া কষ্ট পাইতেছ, নশ্বর আবদ্ধ বস্তুতে প্রেম স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণে যন্ত্রণা পাইতেছ, মানুষকে আর অত ভালবাসিও না, অবিনশ্বর অনাবদ্ধসত্ব ভগবানকে ভালবাস, ভক্তের প্রাণধন ভক্ত বৎসল ভগবান শান্তিপ্রয়াসী লোককে শান্তির পথ নিজেই দেখাইয়া দিবেন, নিজেই স্নেহভরে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে শান্তিধামে লইয়া যাইবেন।' তিনিই মানবকে অভ্যাস করিতে শিখাইয়া দিবেন, তিনিই মানব হৃদয়ে ভক্তি ঢালিয়া দিবেন। ভগবানের করুণাব্যতীত কে কবে ভগবানকে ভালবাসিতে পারিয়াছে?

কৃপা হয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার।
সেই ত তাঁহারে পায় জানিহ এ সার॥ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত॥

ইন্দ্রিয়ের লোপ সাধন করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। ইন্দ্রিয়ের লোপ সাধন করিলেই কি ইন্দ্রিয় জয় হয়? ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের বিষয়

হইতে পৃথক রাখিলেই কি ইন্দ্রিয় জয় হয়? চক্ষু উৎপাটন করিলেই কি দেখিবার ইচ্ছা চলিয়া যায়? আহারের অভাবে কি ক্ষুধা থাকে না? পরন্তু ইন্দ্রিয়কে তৎতৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা লোপ করিলে বা খর্ব্ব করিলে অথবা ইন্দ্রিয়গণকে তৎতৎ বিষয় হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিলে প্রবৃত্তি জয় হয় না। ভৌতিক দেহ এমন কি লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান থাকিতে ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না। দেহ বর্ত্তমান থাকিতে একান্ততঃ কর্ম্মত্যাগ করা যায় না।

নহি দেহভৃতাশক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

১৮।১১ গীতা।

অথচ প্রবৃত্তি এখন সাংসারিক অলীক অনিত্য বস্তুতে আবদ্ধ আছে, তাহাকে একটু বদলাইয়া দাও, অনিত্যের দিকে আছে নিত্যের দিকে ফিরাইয়া দাও, তাহা হইলে আজ যাহাকে বিষয়ানুরাগ বলিয়া উপেক্ষা ও ঘৃণা করা হইতেছে, কাল তাহাই আবার ঈশ্বরে পরমানুরক্তি হইয়া সাধকের প্রাণে শাশ্বত শান্তি প্রদান করিবে। যদি প্রবৃত্তি বা অনুরাগকে একেবারেই লোপ করা হয় তাহা হইলে ভক্তি বা ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগ হইতে পারিবে না। গীতাতে সেই হেতু ভক্তি-মার্গাবলম্বীদের প্রতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "ময্যাবেশ্য মনো" অর্থাৎ ভগবানে মন সন্নিবেশ পূর্ব্বক উপাসনা করিতে হইবে। উদ্ধৃত স্থলে মনকে মননের বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ভগবানকে বা সগুণোপাধিক ঈশ্বরকে মনের মননের একমাত্র বিষয় করিতে বলা হইয়াছে।

এ স্থলে এই সন্দেহ হইতে পারে যে উপনিষদে কথিত আছে যে ব্রহ্মকে মনন করা যায় না। "যন্মনসা ন মনুতে" অর্থাৎ যাহাকে

মন মনন করিতে পারে না—সুতরাং ভগবানকে কি প্রকারে মনের মননের বিষয় করা হয় ? এতদুত্তরে সিদ্ধান্ত এই যে ভগবানকে জানা যায় যে তাহা নয়, জানা যে যায় না তাহাও নহে। 'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ' ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিজ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন। যে বলে আমি তাহাকে জানি না সেত তাঁহাকে জানেই না, যে বলে আমি জানি সেও তাঁহাকে জানে না। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে কিছু কিছু জানা যায়, সগুণত্ব উপাধি যোগে তাহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় বটে, পূর্ণভাবে তাঁহাকে কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। "কিছু জানি কিছু জানি না।" যাহা জানি তাহা অতি অল্প, যাহা জানি না তাহা অনন্ত সমুদ্র বিশেষ। যাহা হউক ভক্তি সাধনে প্রবৃত্তিকেই যে "পরানুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ভক্তিতে পরিণত করিতে হইবে তাহা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত উপাসনায় কিন্তু ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণভাবে সকল প্রকার বিষয় হইতে সতন্ত্র করিয়া নির্ব্বিকল্প অবস্থায় রাখিবার বিধি কথিত আছে। গীতার দ্বাদশাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে সেই হেতু অপরোক্ষজ্ঞানপথাবলম্বীদিগের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে "সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম পূর্ব্বক অব্যক্ত ভাবনা করিতে হইবে।

কি উপায়ে প্রবৃত্তিকে 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'তে পরিণত করা যায়, কেমন করিয়াই বা ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় এই দুইটী জানাই এখন প্রয়োজন। প্রবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির জয় করা নিতান্ত অল্পায়াসসাধ্য নহে, অথচ ইহাই ভক্তিপথ। এই সত্যের অপব্যবহার হেতু ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মগুলির মধ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়াতে অনেক সম্প্রদায়ই বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভক্তি শ্রদ্ধা নহে, কর্ম্ম নহে, জপ নহে, তপঃও নহে, অথচ ইহার

মধ্যে সকলই নিহিত আছে। কর্ম্ম সর্ব্বক্ষণই ভক্তিপথের বিক্ষেপক, কিন্তু ভগবৎপ্রীতি উদ্দেশ্যে ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান ভক্তিসাধনের অনুকূল। বিষয়ে বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহে, এই বৈরাগ্যও ভক্তিরসের শোষক; যেহেতু বৈরাগ্যবশতঃ ভগবৎসেবাতেও মানবকে উদাসীন করে কিন্তু যখন বৈরাগ্য বশতঃ মোক্ষেতেও বিতৃষ্ণা হয় তখন বৈরাগ্যও ভক্তিসাধনের অনুকূল। আত্মা অনাত্মার তত্ত্ববোধই জ্ঞান, জ্ঞানমার্গে আত্মতত্ত্বাদির বোধ বিস্তীর্ণ হওয়াতে ভক্তিতে প্রবৃত্তি অতিশয় শীর্ণ করে; কিন্তু এই জ্ঞানবশতঃ যখন সাধক অদ্বৈততত্ত্ব অন্বেষণ ত্যাগ করিয়া কেবল 'ভগবদীয় আত্মা' মনে করেন তখন আত্মানাত্ম বিবেক জ্ঞানও ভক্তিসাধনের অনুকূল। ভগবানে প্রেম বা ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি। ভগবানের প্রতি অব্যভিচারী অহৈতুক প্রেম ও সেই প্রেম হেতু তাঁহার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানই ভক্তিসাধন, উহাই ধর্ম্ম। ভক্তিসাধনে বা ধর্ম্মে উপাস্য আছেন, উপাসক আছে, উপাসনা আছে, কর্ম্ম আছে, কর্ম্মের উদ্দেশ্য আছে, যাহার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা হয় তিনি আছেন, এ অবস্থায় স্নেহ আছে, প্রেম আছে, ভক্তি আছে, মনুষ্যত্ব আছে। দ্বৈতভাব আছে, জীব আছেন, সকলই আছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গে কিছুই নাই, কেবল "একং জ্ঞান মাদ্যন্তশূন্যম্"। সেখানে কিছুই নাই—প্রেম নাই, ভক্তি নাই, স্নেহ নাই, এক অখণ্ড সত্ত্বা আনন্দও নাই, নিরানন্দও নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গে

ক্ব ধর্ম্মঃ ক্ব চ বা কামঃ ক্ব চার্থঃ ক্ব বিবেকতা।
ক্ব সাধকঃ ক্ব সিদ্ধির্ব্বা স্বস্বরূপেঽহমদ্বয়ে॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

স্বস্বরূপে সর্ব্বত্র অন্তর্ব্বহিরবস্থিত আমাতে ধর্ম্মই বা কি? কাম বা কি? অর্থ বিবেকই বা কি? সাধক সিদ্ধিই বা কি? অদ্বৈতমতাবলম্বী

লম্বী জ্ঞানীদের মতে ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাব জন্মিলে সংসার নিবৃত্তি হইবে অন্যথা নহে ইহা মহাত্মা শঙ্কর প্রণীত অধ্যাত্মোপদেশবিধি। কিন্তু ভক্তিমার্গাবলম্বী মহাত্মাদের মতে ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবকল্পনাই কৈতব-প্রধান (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। ভক্তিপথে উপাস্য উপাসকে চির-কালই প্রভেদ আছে ও চিরকালই প্রভেদ থাকিবে ; ঐক্য নাই ও থাকিতে পারে না। তরঙ্গ সমুদ্র নহে, উপাসক উপাস্য নহেন. উপাসক কখনও উপাস্য হইতে পারে না। ভক্তি শাস্ত্রের মতে জীব ব্রহ্মের একীকরণ পাষণ্ডের মত।

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম,
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৮ অধ্যায়।

এমন কি দেবতারাও পরমেশ্বর (ব্রহ্ম) নহেন। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে কথিত আছে ঃ—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥

ভক্তি শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম ও আত্মা এক নহে। ব্রহ্ম উপাস্য,আত্মা উপাসক। ভগবান হইতে জীবের উৎপত্তি বটে কিন্তু জীব ভগবান নহে।

ভক্ত বলেন,—

"তোহে জনমি পুন, তোহে সমায়ত
সাগর লহরী সমানা"
বিদ্যাপতি।

কিন্তু লহরী সাগর নয়। ভগবান হইতে জীবের ভেদও আছে অভেদও

আছে। ঘনতেজঃসমষ্টি আদিত্যের সহিত অংশস্বরূপ কিরণের যে সম্বন্ধ, জীবের সহিত পরমাত্মারও সেই প্রকার সম্বন্ধ।

পরব্রহ্ম হৈতে জীব অংশত্বে প্রসিদ্ধ
অতএব ভেদপ্রাপ্তি হয় নিত্যসিদ্ধ॥ বৃঃ ভাঃ।

এই অংশ অংশী ভেদ নিত্যভেদ, ইহা মায়া দ্বারা ভ্রমেতে উৎপাদিত নয়। আবার জীব পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নয়—

সচ্চিদানন্দত্ব ব্রহ্ম সাধর্ম্ম্যে অভিন্ন।
রবির কিরণ মত অংশত্বে ত ভিন্ন॥ বৃঃ ভাঃ।

মুক্ত জীবের সহিতও ব্রহ্মের এই প্রকার নিত্যভেদাভেদভাব বর্ত্তমান থাকে। মুক্ত হইলে নিজ তত্ত্বজ্ঞান হয় ও সংসারিত্বরূপ ভ্রম থাকে না। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্য হইতেই উদ্ভূত অথচ সূর্য্য নহে, সেইরূপ উপাসক উপাস্য হইতেই উদ্ভূত কিন্তু উপাস্য নহে। দ্বৈতবাদী মহাত্মা মধ্বাচার্য্য তত্ত্বমুক্তাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

যথা সমুদ্রে বহব স্তরঙ্গা
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব॥ ১০॥

সমুদ্রে যেমন অনেক তরঙ্গ রহিয়াছে সেই প্রকার ব্রহ্মে অনেক জীব রহিয়াছে, কিন্তু তরঙ্গ সকল যেমন সমুদ্র নয় তুমি জীব কি প্রকারে ব্রহ্ম হইবে? জীব আধেয়, ভগবান আধার। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র জগৎকারণ ভক্তিপথাবলম্বীরাও স্বীকার করেন না। তাহাদের মতেও জগতের উপাদানও নিমিত্তকারণ ব্রহ্ম; তাই বলিয়া কার্য্য কারণ নহে, অংশ অংশী নহে।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা।

অদ্বৈতবাদীর মতে কার্য্যকারণে বিশেষ ভেদ নাই, যেমন সুবর্ণ হইতে জাত অলঙ্কারের চিরকালই সুবর্ণত্ব থাকে সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জায়মান বস্তুও ব্রহ্ম। মহাত্মা শঙ্কর প্রণীত অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে উক্ত আছে—

সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথাভবেৎ॥ ৫১

যেমন জল তরঙ্গাকারে দৃষ্ট হয়, তাম্র পাত্রাকারে দৃষ্ট হয়, আত্মাও তদ্রূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিদ্যমান রহিয়াছেন; ঘটাদি যে মৃত্তিকাই তাহা অজ্ঞান বশতই জানা যায় না।

অজ্ঞানান্ন বিজানন্তি মৃদেব হি ঘটাদিকং। ৬৩

এক্ষণে এই প্রপঞ্চের উপাদান কি এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিলেন—

উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরং॥ ৪৫

অদ্বৈত মতে কার্য্যকারণসম্বন্ধই মিথ্যা প্রপঞ্চ; অবিদ্যা হেতু বিশ্ব ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রকাশমান হইতেছে, অবিদ্যার নাশে কার্য্যকারণ ঘটিত বিশ্বের বিনাশ হইবে ও নির্ম্মল ব্রহ্মসত্তা প্রতীতি হইবে।

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে॥

অষ্টাবক্রসংহিতা—২।৭।

যেমন যে পর্য্যন্ত ঝিনুকের জ্ঞান না জন্মে সে পর্য্যন্ত ঝিনুককে রূপা বলিয়া বোধ হয় সেই প্রকার সর্ব্বাধিষ্ঠান অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥

আত্মবোধ। ৭।

অদ্বৈতবাদীদিগের মতে জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞানই অবিদ্যা; ভক্তিবাদীদের মতে জীব ব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা ও তাহা হইতেই সংসারিত্ব রূপ ভ্রম উৎপন্ন হয়।

পরব্রহ্মের অংশভূত নিজতত্ত্ব।
বিস্মৃতি সন্ধানহীন হয় বিশেষত্ব ॥
তাতে সংসারিত্ব রূপ ভ্রম উপজয় ॥
অবিদ্যা হেতুতে যেই সংসারিত্ব হয়।
ভ্রমাত্মক কেবল সে জানিবে নিশ্চয় ॥

ভক্তিশাস্ত্রানুসারে ব্রহ্ম ও আত্মা এক নহে।

আত্মসহ ভগবানে অভেদ বাসনা।
নিশ্চয় জানিহ সেই হয় দুর্ব্বাসনা ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত আছে—

বিষয় স্নেহ সংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ
কল্পকোটিসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে ॥

কিন্তু যোগবাশিষ্টে কথিত আছে যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্বসত্য প্রাকৃতজনের নিকট প্রকাশ করাই গর্হিত।

অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরক জালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ ॥

জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ সকল ভক্তিমার্গানুগামীদের মতে একই ভাবের নহে। মত বিভিন্নতা আছে ও সেই মত বিভিন্নতা হেতু দ্বৈতবাদ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানপথারূঢ় মহাত্মার ধর্ম্ম নাই, কিন্তু তিনি ভিন্ন সকলের পক্ষে ধর্ম্ম প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হওয়া উচিত। ভক্তিপথানুগামী মহাত্মারাও যতক্ষণ না পর্য্যন্ত ভগবানে তন্ময় হইয়া পড়েন ততক্ষণ ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না।

মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব, মনুষ্য ভিন্ন অপর প্রাণি সকল হইতে যে যে গুণ সকল মনুষ্যকে পৃথক করিতেছে সেই সেই গুণ গুলির বা বৃত্তি গুলির সম্যক অনুশীলনই মনুষ্যত্ব। মানবীয় বৃত্তি সকলের সম্যগনু-শীলনে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ও হওয়া স্বাভাবিক। যে বৃত্তির অনুশীলনে মানবের দেবভাবের হীনতা হইতে পারে, অর্থাৎ যে বৃত্তির অনুশীলনে মানবের অপরাপর বৃত্তির অনুশীলন করার ব্যাঘাত হয় সে বৃত্তির অনুশীলন করা কর্ত্তব্য নহে। অনুশীলন বিধি হইলেও সেই স্থলে ইন্দ্রিয় দমনই ইন্দ্রিয়ানুশীলন, সেই স্থলে ইন্দ্রিয় দমনই ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা। অরণ্যে গমন পূর্ব্বক ফল মূল আহার ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব নহে, উহাই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। মনুষ্যহৃদয়ে দয়া আছে, স্নেহ আছে, সহানুভূতি আছে, অসংখ্য সদ্গুণরাশি আছে। ঐ সদ্গুণ সকলের অনুশীলন অরণ্যে সম্ভব নহে। অরণ্যবাস যদি ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ হইত তাহা হইলে বন্য-জন্তুগণ মনুষ্য অপেক্ষা ধার্ম্মিক। যদি বায়ু সেবনই ধর্ম্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে অনেক প্রকার সর্প মনুষ্য অপেক্ষা ধার্ম্মিক। যদি নিস্পন্দী-ভাবই ধর্ম্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে ভেক জাতি মনুষ্য অপেক্ষা ধার্ম্মিক। সংসারে ও জনসমাজে থাকিতে হইলে নানাপ্রকার লোভ মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় তাই বলিয়া কি অরণ্যবাস বা সন্ন্যাস গ্রহণ ধর্ম্ম সঙ্গত? সংসারে পাপ প্রলোভন আছে বলিয়া সংসার ত্যাগ করতঃ

অরণ্যবাস করা কখনও প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে পারে না। সংসার বা জনসমাজ ত্যাগ করিলেই কি মন মানবকে ত্যাগ করে? তাহা হইলেই কি মোহ মানবকে ত্যাগ করে? বরং সংসারে থাকিয়া অনুশীলন দ্বারা বা ভগবানের সেবা দ্বারা অসৎ বৃত্তি গুলি দমন করিবার চেষ্টাই বাঞ্ছনীয় এবং উহাই ধর্ম্ম। সংসার ত্যাগ করিলেই ত মন মানবকে ত্যাগ করে না। নিষ্কর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মাচরণ বা ভক্তিসাধন হয় না। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম জীবনে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, জীবন ধারণ করা ই যায় না। কর্ম্ম করিতেই হইবে, যেহেতু কর্ম্মত্যাগ করিয়া কেহ একদণ্ড থাকিতে পারে না।'

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

গীতা।১৮।১১

স্বভাবজ কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য মাত্রেই আবদ্ধ। যদি মোহ বশতঃ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেও কর্ম্মবশ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবেই।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

১৮।৬০

সত্য বটে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানবে বদ্ধ হইতে থাকে সুতরাং ত্যাগই বিধি; কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে মানবের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হয় না। কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।

গীতা ১৮।২

সুতরাং ধর্ম্মজীবন উন্নত করিতে হইলে অনুশীলনই প্রয়োজন, এবং যে স্থানে সহজে অনুশীলন হইতে পারে এমন স্থানই প্রশস্ত। শ্রীচৈতন্য-দেব সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে, পাছে বৈষ্ণবগণ সংসার ত্যাগ করাকেই ধর্ম্ম জীবনের সোপান মনে করেন এই ভয়ে তিনি নিত্যানন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণকে গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন। গীতার উক্ত বিবিক্তদেশসেবিত্ব কথাটীর দ্বারা এমন বোধ হয় না যে অরণ্যবাস করাই শ্রেয়ঃ। তবে ভগবানের আরাধনা ও পূজার জন্য নির্জ্জনে বাসও উচিত।

মানবের বৃত্তি সমুদায়ের যথাযথ অনুশীলনই যখন ধর্ম্ম, ভগবানের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানই যখন করণীয়, তখন বাহ্যিক কার্য্য আন্তরিক উন্নতি বিধায়ক কর্ম্ম অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। ভক্তি ও ধর্ম্ম হৃদয়ের অভ্যন্তরের বস্তু। যজ্ঞ করা ধর্ম্ম কি না? অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ইষ্ট মন্ত্র জপ করিলে কিংবা উপবাস ব্রতাদি করিলে ভক্তি সাধন হয় কি না? যদি উক্ত প্রকারের কার্য্য সমূহ দ্বারা সাধক মনে করেন যে তিনি ভগবানের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিম্বা সেই কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার ভগবৎসত্ত্ব উপলব্ধি হইতে থাকে, কিম্বা ঐকান্তিক ভক্তির সহিত করা হইতেছে এমন বোধ হয়, তাহা হইলে উহারা ধর্ম্মের অঙ্গ, সেই সাধন ও ভক্তিসাধন। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে উক্ত কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। অন্তঃকরণকে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক করণ ফলপ্রদ নয়। ভক্তি বিহীন কর্ম্মে ভগবৎপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান কোনক্রমে কোন কালে পরি-ত্যাজ্য নয়; যেহেতু যজ্ঞ দান তপস্যা দ্বারা সাধকের হৃদয় উন্নত ও পবিত্র হয়।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

গীতা ১৮।৫।

মৌলিক বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ সংকল্পবিহীন কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। কিন্তু বিশুদ্ধভাবে সংকল্প বিহীন কর্ম্ম সাধন অত্যন্ত দুরূহ, পরন্তু আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম সেশ্বর মত নহে। সেশ্বর ধর্ম্মে ভক্তি বিহীন কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্মই নয়।

যে পূজাতে যে জপ বা ধ্যানে বা ক্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরাগের চিহ্ন নাই, প্রাণের ব্যাকুলতা নাই, আগ্রহ নাই, উপাস্যের সহিত নৈকট্য স্পৃহা নাই, সে পূজা জপ ধ্যান ধর্ম্ম নয়, ভক্তিসাধন নয়, লোকাচার মাত্র। যে ইষ্টদেবতার পূজায় ইষ্টদেবের জন্য সারা দিনরাত্র প্রাণ ব্যাকুল হয় না, সে পূজা পূজাই নয়। যদি হৃদয়ে অনুরাগ না থাকে তাহা হইলে কি বৈদিক কি পৌরাণিক কোন সাধনাই প্রকৃত সাধনা পদবাচ্য নয়। অনুরাগী সাধক যখন একবার মাত্র প্রাণের ভিতর তাঁহার ভগবানের সাক্ষাৎ পান, অথবা একবার মাত্র ভগবানের অস্তিত্ব প্রাণে উপলব্ধি করেন, তখন তাহার প্রাণে কি যে একপ্রকার স্বর্গীয় আনন্দ উপস্থিত হয় তাহা প্রকাশ করা যায় না। চিনির মিষ্টতা যে চিনি খাইয়াছে সেই জানে, অপরে জানিতে পারে না। ভগবদুপাসনার আনন্দ ভগবদুপাসকই জানে ও উপলব্ধি করে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

উপনিষদে কথিত আছে "তমেব বিদিত্বা অমৃতত্বমেতি" তাঁহাকে জানিয়াই লোকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অধুনা কি উপায়ে তাঁহাকে জানা যায়, কি উপায়ে ভগবদুপলব্ধি হয়? বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ

প্রভৃতির দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না, ভগবদুপলব্ধি হয় না। কেবল ভগবানে অব্যভিচারিণী ঐকান্তিকী অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা ভগবদুপলব্ধি হয়। গীতা ১১।৫৩, ১১।৫৪। বিরুদ্ধধর্ম্মবান ভগবানকে অনেকবেদস্বীকরণের দ্বারা কিংবা গ্রন্থার্থধারণশক্তি দ্বারা কিংবা বহুশ্রুতি দ্বারা পাওয়া যায় না, তিনি যাঁহাকে বরণ করেন তিনি তাঁহাকে পান। কঠ ১।২।২৩।

ভাগবতেও উক্ত আছে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা ॥১১।১৪।২০
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানাপি সম্ভবাৎ ॥ ১১।১৪।২১

"হে উদ্ধব! যোগাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা ভক্তি দ্বারা আমাকে যেমন পাওয়া যায় ও বশ করা যায়, যোগ বিজ্ঞান বেদাধ্যায়ন তপস্যা এবং দান দ্বারা আমাকে তেমন লাভ করা বা বশ করা যায় না।" ভগবান ভক্তাধীন, জ্ঞানাধীন নন। "আমি সাধুদিগের প্রিয়, আমি কেবল শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য। আমার প্রতি ভক্তি চণ্ডাল-দিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।" ভক্তি সাধনে অধিকারি ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, ভক্তিমার্গ সকলেরই; ভক্তি দ্বারা যেমন জাতিচণ্ডালত্ব দোষ নষ্ট হয় সেই প্রকার কর্ম্মচাণ্ডালত্ব বিনষ্ট হয়।

নারদীয়ে কথিত আছে,—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তোদ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যঃ যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥

স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

ভক্তিমার্গে অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই, সকলের সমান অধিকার। সাধু মহাত্মগণই যে ভক্তিসাধনের অধিকারী অপরে নহে এমন নয়। যেমন গঙ্গাতে স্নান করিবার সকলেরই অধিকার আছে, সেই প্রকার ভক্তিসাধনে সকলেরই সমান অধিকার। দুরাচার ব্যক্তিও ভক্তি সহকারে ভগবানকে ভজনা করিলে ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হন। গীতা নবম অধ্যায় ত্রিংশত্তম শ্লোক। নরকস্থ নারকীরাও ভগবানের নাম স্মরণ করিলে নরকযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

নৃসিংহপুরাণ ৮ অধ্যায় ২৮।২৯ শ্লোকে কথিত আছে,—

মহাপাতকযুক্তোপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
পুনস্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ॥

ভগবানের স্বরূপ কিপ্রকার, কি উপায়েই বা ভগবানকে হৃদয় মধ্যে পাওয়া যায়, এই বিষয়ে উপনিষৎ সমূহে অতি স্পষ্টভাবে উপদেশ আছে। তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, মহান্ হইতেও মহান্। তিনি 'আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ', তিনি অচল হইয়াও দূরে যান, শয়ান অবস্থাতেও চলেন অর্থাৎ তাঁহার অনন্তব্যাপিত্ব হেতু সকলই তাঁহাতে সম্ভব হয়। তিনি 'মদামদ' অর্থাৎ তিনি আনন্দ স্বরূপও বটে অথচ আনন্দ স্বরূপও নন। তিনি

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ কঠ ১।৩।১৫

উক্ত প্রকারের ব্রহ্মকে জানিয়া লোকে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়। তিনি 'অরসম্', আবার তিনিই 'রসো বৈ সঃ' রসস্বরূপ। তিনি মন্দ তিনি অমন্দ অর্থাৎ তিনি বিরুদ্ধগুণের অদ্ভুত সমাবেশ, অথচ ইনিই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইনিই একমাত্র অবলম্বন, এই আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া লোকে ব্রহ্মলোকে পূজনীয় হন।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ কঠ।

ভগবানকে ঐকান্তিকী অব্যভিচারিণী ভক্তি ভিন্ন জানা যায় না। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার মধ্যে দর্শন করেন। "ত্বমাত্মস্থং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"। নিজের অন্তঃকরণকে পরিত্যাগ করিয়া মানব বাহ্যজগতে ভগবানের অস্তিত্ব যতই অনুসন্ধান করুন না কেন তাঁহাকে পাইবেন না। নেতি নেতি করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবেই, যেহেতু তিনি অপ্রমেয়, যেহেতু 'ন চ তস্য লিঙ্গম্' সুতরাং কেবল মাত্র বাহ্যজগতে ভগবদনুসন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে স্বয়ম্ভূ কর্তৃক স্বকীয় স্বরূপ ও কারণনির্ণয়রূপ উপাখ্যানটীতে পূর্ব্বোক্ত সত্যটীর সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে উপদেশ আছে।

কঠোপনিষদে উক্ত আছে,—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো নলভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
ঽশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে অধ্রুব অর্থাৎ অনিত্য দ্বারা নিত্য বস্তু পাওয়া যায় না (কঠ ১।২।১০)। আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে পাইতে হয়। ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগের দ্বারা সেই দুর্দর্শ অর্থাৎ অতি কষ্টে দর্শনীয়, প্রাকৃতবিষয়বিকারবিজ্ঞানে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধির দ্বারা উপলভ্যমান, গহ্বরেষ্ঠ সনাতন দেবতাতে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক হর্ষ শোক পরিত্যাগ করেন। কঠ ১।২।১২। পুনশ্চ

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ কঠ১।৩।১২

সেই "হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৢপ্তঃ" পুরুষস্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন মহাত্মগণ যে মহৎ সত্যসকল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি স্সুন্দর ভাবে উপনিষদ মধ্যে নিহিত আছে।

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষুঃ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ (কেন ১।২)। অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই চক্ষুঃ শ্রোত্র বাগিন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ আপনাপন শক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহারা সেই সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিতেছে। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষুঃ, কিন্তু স্বয়ং চক্ষুঃ নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন অথচ স্বয়ং মনঃ নহেন। তিনি সকলের কারণ ও আশ্রয়। বাক্য যাহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু যিনি বাক্যকে প্রেরণ করিতেছেন তিনিই ভগবান। মন যাহাকে মনন করিতে পারে না অথচ যিনি মনের প্রত্যেক মনন জানেন তিনিই ব্রহ্ম। তিনি শক্তিস্বরূপ, তেজঃস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। বিশ্বের মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহা তাহাতে উদ্ভূত, ও তাঁহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। তিনিই সূর্য্যের তেজঃ। "তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বম্"।

গীতাতে উক্ত আছে,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১৫।১২

ইনি এই জীবের পরমগতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি জীবের পরম লোক, ইনি জীবের পরম আনন্দ, এই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে জীব উপভোগ করে। তিনি আনন্দ স্বরূপ "আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" তিনি আনন্দময়, তিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি প্রেমময়। তাহার সত্তাই প্রেম ও আনন্দ। তিনি সুন্দর, তাহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র বিশ্বসংসারকে এত সুন্দর করিয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে কথিত আছে—"রসো বৈ সঃ। রসোহ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি।" ২।৭। সেই পরমাত্মা তৃপ্তিহেতু রস স্বরূপ। সেই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করে। রস শব্দের অর্থ অনুরাগ (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে রসকে সাংসারিক অনুরাগ বলা হইয়াছে)। তিনি প্রেমস্বরূপ তিনি আনন্দস্বরূপ। যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন তাহা হইলে কে শরীরচেষ্টা করিত? কেই বা জীবিত থাকিত? ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ।
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
এষ হ্যেবানন্দয়তি॥ ২।৭

ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন, সেই আনন্দস্বরূপ ভগবান হইতে চরাচর ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। "আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জাতানি"। তিনি আনন্দময়, তিনি প্রেমময় তিনি নিত্য সত্য, তিনিই সৎ অর্থাৎ দেশ কাল দ্বারা তাঁহার সত্তা আবদ্ধ নয়, অথচ প্রেমপাশে তিনি ভক্তের কাছে বাঁধা।

"স্থানেতে এখানে সময়ে এখন,
প্রাণসখা আমার প্রিয় নিকেতন।"

তিনি "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ"। তাহার জন্ম মৃত্যু বিকার পরিবর্ত্তন কিছুই নাই। তিনি জ্ঞানময় কিন্তু তাহার জ্ঞান বা ক্রিয়া স্বাভাবিক (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।৮)। জীবের পক্ষে যেমন জ্ঞান-বলক্রিয়া ইন্দ্রিয় ও অপরাপর পদার্থের উপর নির্ভর করে ভগবানের জ্ঞানবলক্রিয়া সে ভাবের নয়, কিছুর উপরই নির্ভর করে না, অপরোক্ষাস্বত। তিনি আনন্দময় প্রেমময় জ্ঞানময়। তিনি অনন্ত অথচ প্রাণের প্রাণ, তিনি দুর হইতেও দূরে, নিকট হইতেও নিকটে।

ভগবৎস্বরূপজ্ঞানের উপর ভক্তিসাধন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। যদি কেবল ভাবের উপর কিম্বা কল্পনার উপর ভগবৎস্বরূপজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনা করা হয় তাহা হইলে ভক্তিসাধনের ভিত্তিও বালুকার উপর সংস্থাপিত হইবে। স্বরূপজ্ঞানরূপ প্রস্তরের উপর ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক সাধনগৃহ নির্ম্মাণ করিলে সে গৃহ সহজে পতিত হইবে না। যদি অধ্যাত্মযোগের উপর ভিত্তি স্থাপনা করা হয়, যদি ভগবৎস্বরূপজ্ঞান প্রকৃত ভিত্তির উপর হয় তাহা হইলে ভক্তিসাধনও স্থির এবং অচল হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্ বাক্যগুলি হইতে বেশ প্রতীয়মান হয় যে ভগবান একাধারে সগুণ ও নির্গুণ দুইই, অর্থাৎ তিনি বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট। তিনি সগুণ বটে নির্গুণও বটে। সৎও বটে অসৎও বটে, সৎও নন অসৎ নন। ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। গীতা ১৩।১২। "বিরুদ্ধগুণবত্ত্ব ঈশ্বরত্ব"। যেমন নদী সমূহ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ সগুণত্ব অগুণত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণ সকল পরমেশ্বরে প্রবেশ করে ঃ—

নিঃসন্ধি সন্ধিত্ব নির্ব্বিকার সবিকার
নিরীহত্ব ঈহাবত্ত্ব নির্ব্বিশেষ আর।

বিশেষত্ব আদি যত বিরোধ বিশেষ।
তাঁহাতে সকল যাই করয়ে প্রবেশ॥

অদ্বৈতবাদিরাও সগুণোপাধিক ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিতে না পারায় উহাকে মায়াশ্রিত ব্রহ্ম ও নির্গুণোপাধিক ব্রহ্মকে কূটস্থ ব্রহ্ম বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন। যাহা হউক দার্শনিক বিচার পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ দুইই, তবে তিনি সগুণোপাধিক বলিয়াই যে তাঁহাতে মানবের সমগ্রধর্ম্ম আরোপ করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। স্বীকার করি প্রেমের লক্ষণ মানবীকরণ, কিন্তু মানবের দৌর্ব্বল্যও কি ভগবানের উপর আরোপ করিতে হইবে? ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন প্রেমিক কবি হাফেজ্ বলিয়াছিলেন "প্রেমময়! আমি যেন তোমার সুন্দর মুখের জুল্‌ফি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি"। কিন্তু ইহা কবির উৎপ্রেক্ষা। প্রেমে সবই হয় কিন্তু সেই প্রেমবশতঃ যদি এমন মনে করা হয় যে ভগবান কোন এক প্রকার রূপ বা অবস্থা বা বর্ণ-বিশিষ্ট, বা তিনি কোন এক বিশেষ স্থানে বিশেষভাবে বর্ত্তমান আছেন, কিম্বা বিশেষ দেশে বিশেষ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, কিংবা তাহার প্রেম জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির মধ্যে কোনটী অসম্পূর্ণ ও বাকী কয়েকটী অনন্ত, তাহা হইলে সে কল্পনার উপর ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তি সাধন হইতে পারে না। সে কল্পনা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও ভ্রমাত্মক। পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, বিশ্ব মধ্যে আর যাহা কিছু পদার্থ আছে, সকলেই দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ। কেবল এক অখণ্ড সত্তা, ভূম স্বরূপ ভগবান দেশকাল দ্বারা অনাবদ্ধ। ভগবান্ এখানে আছেন সেখানে আছেন, ভগবান আজ আছেন, কাল ছিলেন, কাল থাকিবেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও থাকিবেন। তাঁহার অস্তিত্বের কোন বিশেষণ নাই, তিনি এখানে অল্প আছেন

সেখানে বেশী তাহা নহে, তিনি এই জাতির মধ্যে বেশী আছেন অপর জাতি সকলের মধ্যে কম আছেন তাহা নহে। তিনি সে সময়ে বেশী ছিলেন এখন কম আছেন তাহা নহে। তিনি বিশেষণবিহীন অখণ্ড সত্যস্বরূপ। সেইপ্রকার তিনি বিশেষণবিহীন আনন্দস্বরূপ। তিনি বিশুদ্ধ প্রেম, বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশুদ্ধ শক্তি। তিনি প্রেমময় জ্ঞানময় শক্তিময়। তাঁহার জ্ঞান প্রেম শক্তি সত্তার কোন প্রকার বিকার নাই। এস্থলে বিকার অর্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় নাই, প্রাচুর্য্যবশতঃ 'ময়ট্' প্রত্যয় ব্যবহার করা হইয়াছে। তথাচ ব্রহ্মসূত্রে "বিকার শব্দান্নেতিচেৎ প্রাচুর্য্যাৎ" ১।১।১৩। যেমন সুবর্ণ ময়ের অর্থ সুবর্ণের বিকার সেইরূপ আনন্দময়ের অর্থ আনন্দের বিকার নহে। 'আনন্দময়' এই বাক্যটির দ্বারা প্রচুর আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, অনন্ত আনন্দ বুঝায়। তিনি এক দিকে যেমন প্রেম শক্তি ও জ্ঞানময়ত্বের জন্য সগুণ তেমনি নির্গুণ। তাহার সগুণত্বটুকু ছাড়িয় কেবল নির্গুণত্বটুকু ধরিলে ভুলকরা হয়, আবার নির্গুণত্বটুকু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সগুণত্বটুকু কল্পনা করাও ভ্রম। দুগ্ধে যেমন অলক্ষিত ভাবে ঘৃত থাকে তেমনি নির্গুণের মধ্যে সগুণ রহিয়াছে।

যদি মনে করা হয় যে ভগবান কেবল চতুর্ভুজ, কিম্বা তিনি কেবলমাত্র শ্যামমূর্ত্তি, অথবা তিনি পৃথিবী হইতে অতিরিক্ত স্বর্গ বিশেষে বাস করিতেছেন এবং লোক পাঠাইয়া পৃথিবীর সংবাদ লইতেছেন তাহা হইলে ভগবান সম্বন্ধে সে কল্পনা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। সেই ভ্রমের উপর ভক্তি সাধনের ভিত্তি স্থাপনা করা অযৌক্তিক। আমাদের সহিত, এই পৃথিবীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ।

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥" গীতা ১৫।১৩

পক্ষান্তরে যদি মনে করা হয় যে ভগবান কখনও চতুর্ভুজ হইতে পারেন না, কখনও ইহা হইতে পারেন না, উহা হইতে পারেন না, তাহা হইলে সেই অবিশ্বাসের উপরও ভক্তিসাধন দাঁড়াইতে পারে না। যথার্থ বটে তিনি ব্যষ্টি ভাবে ইহা কি উহা নন, তবে তাহার শক্তির উপর বন্ধন থাকিতে পারে না। তাঁহার শক্তি অনাবদ্ধা মানবে ভগবান সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারে তাহা অতি সামান্য। মানবে ভগবানকে ধরিতে পারে না কেবল ছুঁইয়া আসিতে পারে মাত্র। বুদ্ধদেবের প্রিয়শিষ্য আনন্দ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! আপনি কি যাহা কিছু মানবের জানিবার প্রয়োজন সকলই বলিয়াছেন"? সেই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব আনন্দকে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ হইতে পত্র লইতে বলিলেন ও প্রতিপ্রশ্ন করিলেন "তোমার হস্তস্থিত পত্রগুলি বেশী কিংবা বৃক্ষস্থ পত্রগুলি বেশী?" তদুত্তরে আনন্দ বলিলেন "বৃক্ষস্থ পত্রগুলি হস্তস্থিত পত্রগুলি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশী।" সেই প্রকার যে যতই জ্ঞানী হউক না কেন তাহার জ্ঞান ঐ হস্তস্থিত পত্র অপেক্ষা বেশী নয়। মানবের জ্ঞান অতি সামান্য, ইহার দ্বারা ভগবানকে মাপ করিতে যাওয়া অত্যন্ত ধৃষ্টতা।

উপনিষদে কথিত আছে ঃ—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

কেন ২।৩

যাহার এরূপ নিশ্চয়জ্ঞান হয় যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানি নাই তাহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে, আর যাহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি তাহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে আমি ব্রহ্মস্বরূপ বুঝি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ

জ্ঞানবান নহে তাহার এই বিশ্বাস যে সে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছে। সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের জ্ঞান লাভ হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলিয়া যে ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না তাহা নয়। পরন্তু তাহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। তথাচ কেন ২।৫

'ইহ চেদবদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।'

তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি যে প্রকৃতই দুরূহ তাহা নয়, সহজ ও স্বাভাবিক। চক্ষুঃ যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তুকে দর্শন করে ব্রহ্মবিদেরা সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সেই পরম স্থানকে সর্ব্বদা দর্শন করেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্"।

প্রাচীনকালের প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানকে করতলগত আমলকের ন্যায় স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা একপক্ষে যেমন দুরূহ অপর পক্ষে তেমনই সহজ ও স্বাভাবিক। সেই আত্মপ্রত্যয়সার ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিপূর্ব্বক ভক্তি সাধন করাই প্রকৃত ভগবদুপাসনা। যদি প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে উহা ভগবদুপাসনা নহে অপর দেবোপাসনা মাত্র।

এই বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট, সগুণ হইয়াও নির্গুণ, ভগবানের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানই প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান। "কিং কর্ম্ম? যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ" (মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রণীত মণিরত্নমালা)। সেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। ভগবানকে প্রীত করিতে হইবে ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইহাই নির্দ্দেশ। গীতার স্থানে স্থানে অনুশাসন আছে "মৎকর্ম্মপরমোভব" "মৎকর্ম্মকৃৎ"—ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ হও,

ভগবানের কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। ভক্তিশাস্ত্রকার মাত্রেই উপদেশ দেন ভগবানের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান কর। অধুনা যদি ভগবানের প্রিয়কার্য্য থাকে তাহা হইলে তাহার অপ্রিয় কার্য্যও ত আছে? অথচ ভগবানের প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই। ভক্তি শাস্ত্রের অনেক স্থলে উক্ত আছে যে ভক্ত ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে সেই ভগবানের প্রিয়। তবে কি ভগবানের অপ্রিয়ও আছে? উক্ত দুইটী ভাবের মধ্যে কি পরস্পর বিরোধ দোষ আছে? ভগবান অনন্ত প্রেমস্বরূপ, তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় কিছুই নাই। ভগবান্ এক অর্থে সগুণ বলিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে মানবীকরণ যুক্তসঙ্গত নয়। ভগবানের নিকট হইতে যে ভক্ত যতটা প্রেম সংগ্রহ করিতে পারেন, যে ভক্ত ভগবানকে যত বেশী ভালবাসেন, তিনি আপনাকে ভগবানের তত প্রিয় মনে করেন। ভগবান "ফল দেন রুচি অনুসারে, ইথে কৃপার মহিমা পরম বিস্তারে।" বস্তুতঃ ভগবানের কাছে কোন ইতর বিশেষ নাই। ভগবানের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেই কি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন আর অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেই কি রুষ্ট হইবেন? তবে তিনি কি সাধারণ মানবের মতন প্রীতি ও ক্রোধের বশীভূত? উক্ত প্রকার সন্দেহের সিদ্ধান্ত এই যে ভগবানের কথা ছাড়িয়া দাও, ভগবদ্ভক্তই প্রীতি ও ক্রোধে সমভাবাপন্ন। কেহ যদি ভগবদ্ভক্তের কোন অপ্রিয় কার্য্য করেন তাহা হইলে ভক্ত তাহাতে রুষ্ট হন না। কেহ কোন প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রতি তিনি বিশেষভাবে আহ্লাদিত হন না। ভক্তই আনন্দময়। ভগবানের স্নেহের তারতম্য নাই। এই প্রকারের সন্দেহের সমাধান করিবার অভিপ্রায়েই যেন মহাত্মা অক্রুর ভাগবতের দশম স্কন্ধে কহিলেন ঃ—

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো বা
প্রিয়ো বা দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।

তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা*
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ১০।৩৮।২২

তবে ভগবানের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মীর হৃদয়ে স্বতঃই আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়। ভগবানের প্রতি কর্ম্মীর প্রেম অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি হয়। ভগবানের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে ভগবানের কোন উপকার করা হয় না, ভগবান তাহাতে রুষ্ট বা তুষ্ট হন না, কিন্তু সাধকের ধর্ম্মজীবনের উন্নতি সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সাধক ভগবানের প্রিয় কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। অধুনা ভগবানের প্রিয় কর্ম্ম কি? তুলসীমালাধারণ, রুদ্রাক্ষ ধারণ, তিলক ধারণ, তিল দান, তীর্থযাত্রা, উপবাস, এই গুলিই কি ভগবানের প্রিয়কার্য্য? কোন গুলি ভগবানের প্রিয়কার্য্য আর কোন গুলি নয় ইহা কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? কোনগুলি ভগবানের প্রিয়কার্য্য এই প্রশ্নের সমাধানের উপর বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আপন আপন আচার ও কর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পাছে প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে এই ভয়ে আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করি।

উপনিষদে কথিত আছে ভগবান্ প্রেম ও আনন্দ স্বরূপ। তিনি যে পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ আনন্দ, এ বিষয়ে ভক্তিপথাবলম্বিদিগের মধ্যে কোন মতবিভিন্নতা হইবে না। সুতরাং অসাম্প্রদায়িক ভাবে কহিতে হইলে পূর্ণ প্রেম হইতে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করা হয়, বা পূর্ণ বিশুদ্ধ আনন্দ উদ্দেশ্যে যে কার্য্য করা হয়, তাহাই ভগবানের প্রিয় কার্য্য। বন্যাতে দেশ ভাসিয়া সহস্র সহস্র লোক গৃহশূন্য হইয়া অনাহারে অত্যন্ত কষ্টে প্রাণ হারাইতেছে, এস্থলে যদি নিঃস্বার্থ ভালবাসার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কেবল অনেকগুলি লোককে ঘোরতর

নিরানন্দ হইতে আনন্দে আনিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাহাদের কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে বাঁধ সংস্কার বা গৃহ নির্ম্মাণ বা অন্নদান করা হয় তাহা হইলে উহা ভগবানের প্রিয় কর্ম্ম। কোন্ কর্ম্ম ভগবানের প্রিয় জানিতে হইলে কর্ম্মীর হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ কি প্রকারের মানসিক ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা হইতেছে ও কর্ম্মীর কর্ম্ম করণের উদ্দেশ্য কি এই দুইটী জানা প্রয়োজন। সর্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেম দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিশুদ্ধ স্বর্গীয় আনন্দ উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা হয় তাহাই ভগবানের প্রিয়কর্ম্ম। লোকে প্রশংসা করিবে কিম্বা এই কার্য্য না করিলে লোকে নিন্দা করিবে এই প্রকারের মানসিক ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইষ্টা পূর্ত্তাদি কার্য্য করণকে কখনও ভগবানের প্রিয়কার্য্য বলা যাইতে পারে না। একই কার্য্য প্রণোদক ভাব-ভেদে স্বীয়কর্ম্ম বা ভগবৎকর্ম্ম হয়। উল্লিখিত উদাহরণ স্থলে 'আহা জলকষ্ট অত্যন্ত কষ্টকর, এত গুলি লোক জলের জন্য না জানি কত কষ্ট করিতেছে' এই প্রকার মনে করিয়া হৃদয়ে দয়া ভালবাসা ও সহানুভূতির সহিত শত্রু মিত্র সকলকার সমান ভাবে উপকারার্থে কূপ বা পুষ্করিণীখনন ভগবানের প্রিয়কার্য্য। অতি সামান্য কার্য্যও যদি প্রেম বশতঃ করা হয় তাহা ভগবানের প্রিয়কার্য্য। প্রেমের সহিত মুষ্টি-ভিক্ষা অপ্রেমের সহিত সেতুবন্ধন অপেক্ষা গরীয়সী। প্রেমে শত্রু মিত্রের প্রভেদ নাই। মিত্রকে ত সকলেই ভালবাসে, সমভাবে শত্রুদের ও মিত্রদের হিতানুষ্ঠান করাই প্রেমের কার্য্য। ভগবান্ আনন্দ স্বরূপ। সেই আনন্দ উদ্দেশ্যে প্রেমের সহিত কার্য্যানুষ্ঠানই ভগবৎকর্ম্ম; তাহাই গীতার কথিত "মৎকর্ম্ম"। প্রেমে আকাঙ্ক্ষার গন্ধ নাই, তাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহার প্রীতি ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।

ভক্ত নিষ্কর্ম্মা নন, তিনি কার্য্যপটু "দক্ষ"। কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি প্রকারে সুচারুরূপে অনায়াসে সম্পাদন করা যায় তাহার উপায় ও পথ সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ। তিনি কেবল প্রেমে পাগল নন, তিনি কেবল ভাবে উন্মত্ত নন, তিনি কর্ম্মবীর, তিনি স্থির মতি, ধীর ও শুচি। মানবের কষ্ট দেখিলে প্রেমিকের প্রাণ গলিয়া যায়। কিসে কষ্ট নিবারণ হইবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তিনি তিলার্দ্ধ সময় অলস নন, অথচ কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিন্দুমাত্র উদ্যম নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্মে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ নন। এই কার্য্য অতি দুঃসাধ্য ও আমি অতি দুর্ব্বল এই ভাবনার বশীভূত হইয়া ভক্ত কখনও পশ্চাৎপদ হন না। তিনি ভগবানকে একান্তমনে স্মরণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অগ্রসর হন এবং ভগবানে ঐকান্তিক নির্ভর হেতু সেই স্বর্গীয় বলে তিনি কার্য্য সমাধা করেন। কারাগৃহের কষ্ট দেখিয়া মহাপ্রাণ হাউয়ার্ড যখন সমগ্র ইউরোপে কারাসংস্কারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তখন তিনি একবারও ভাবেন নাই যে বিস্তৃত ইউরোপ মহাদেশের কারা সংস্কার কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, কত বিপজ্জনক, আর তাহার ক্ষমতা কত অল্প। তিনি ভাবেন নাই, পশ্চাৎপদও হন নাই। প্রতিক্ষণেই ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ভগবানে সকল সমর্পণ পূর্ব্বক মানবের অকারণ যন্ত্রণায় প্রেম হেতু ব্যথিত হইয়া তিনি ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কর্ত্তব্য কার্য্য কিসে সুসম্পন্ন হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন ও কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিতে গিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন, অবশেষে তাহার সেই মহৎ কার্য্য সমাধা হইল। দরিদ্র মূলারের প্রথম জীবনে তিনি কি জানিতেন যে কেবল মাত্র প্রার্থনার বলে ভগবান তাহার দ্বারা সহস্র সহস্র অনাথ বালক বালিকার ভরণ

পোষণ ও শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করাইবেন? অথচ মুলার জীবনে একটী কপর্দ্দকেরও সংস্থান করেন নাই ও কখনও পরমুখাপেক্ষী হন নাই। ভক্তজীবনী সর্ব্বত্রই সমান। ভক্ত চিরকালই কর্ম্মী অথচ সকাম-কর্ম্মানুষ্ঠানে উদাসীন। প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লোক হিতার্থে ভক্ত স্বীয় ধন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া স্থিরবুদ্ধি ও অটল সাহসের সহিত অগ্রসর হন। ভক্ত ভগবানের প্রিয়কার্য্য না করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া কখনও থাকিতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদ যাহাতে প্রীতি লাভ করেন এমন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারেন না।

প্রবৃত্তি মার্গের অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও তাহাই মানবের সহজ ও স্বাভাবিক পথ। নিরোধ অপেক্ষা অনুশীলনই কর্ত্তব্য।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥
গীতা ১৮।৪৮

ভগবানকে প্রীত করিতে হইবে। ভগবানকে ভগবদ্ভাবেই প্রীত করিতে হইবে এবং সেই প্রেম অহৈতুক ও অব্যভিচারী হওয়া আবশ্যক। স্বর্গ বা ইন্দ্রত্ব, এমন কি ব্রহ্মত্ব বাঞ্ছা করিয়া যদি ভগবানকে উপাসনা করা যায় তাহা হইলে সে প্রেম অহৈতুক নয়। ভগবানকে যে যেপ্রকারে প্রার্থনা করিবে সে সেই ভাবে ভগবানকে পাইবে। দেব ভাবে প্রার্থনা করিলে দেব ভাবেই পাবে। সকামভাবে উপাসনা করিলে কামনা সিদ্ধ হইবে, নিষ্কাম ভাবে উপাসনায় শান্তি পাইবে।

গীতায় উক্ত আছে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

সকাম ভাবেই হউক আর নিষ্কাম ভাবেই হউক যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সকল প্রকারে আমারই ভজনমার্গের অনুবর্ত্তন করে।" যাহারই উপাসনা করা হউক না কেন তাহা ভগবানেরই উপাসনা, তবে সেই উপাসনা অবিধি পূর্ব্বক কৃত হওয়াতে প্রকৃত ভগবদুপাসনার সমান নহে (গীতা—৯।২৩)। প্রেমের সহিত দেবতাদিগকে ভজনা করিলেও দীনবৎসল দেবগণ ছায়ার ন্যায় ভক্তগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে,—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ১১।২।৬

সুকৃতিমান্ লোক সুকৃতির তারতম্যানুসারে ভগবানকে চার প্রকারে ভজনা করে:—১ প্রতিষ্ঠাহীন আর্ত্ত, ২ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ৩ পুনঃ-প্রাপ্তিকাম ভ্রষ্টৈশ্বর্য্য ব্যক্তি ৪ জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ভাগবতকারও চার প্রকারের ভক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন; তাহার মধ্যে দুইটীকে প্রকৃত ভগবদুপাসনা বলা যায় কিনা সন্দেহ। হিংসা দম্ভ বা মাৎসর্য্যভরে যে ভক্তি করা হয় তাহা তামসী ভক্তি, বিষয় যশ কিম্বা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া যে ভক্তি করা হয় তাহা রাজসিক ভক্তি, পাপক্ষয় মানসে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন আকাঙ্ক্ষায় ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে বা কর্ত্তব্য বোধে যে ভক্তি করা হয় তাহা সাত্ত্বিক, এবং অবিচ্ছিন্নমনোগতি অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি নির্গুণ ভক্তি। নির্গুণ ভক্তিকে ভাগবতকার মুখ্যপথ বলিয়াছেন।

মদ্‌গুণশ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুকীরবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ৩। ২৯

সাগরে গঙ্গাসলিলধারার ন্যায় যে মনোগতি ভগবানের গুণ শ্রবণ মাত্র ফলানুসন্ধান না করিয়া সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিহিত হয় সেই মনোগতিরূপ ভক্তি নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। নির্গুণ ভক্তদিগকে সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা ভগবানের সেবা ভিন্ন আর কিছুই চান না। এই প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক ভক্তি বলা যায়, এই ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তি হয়।

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ভাঃ—৩।২৯

সকল প্রকারের ভক্তদিগকেই ভগবান অভীষ্ট প্রদান করেন, যে যে ভক্ত ভগবানের যে যে আকৃতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন ভগবান তাহাদিগকে সেই সেই মূর্ত্তির উপর অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করেন (গীতা ৭।২১)। তাঁহারা সেই ভগবৎপ্রদত্তশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আরাধনা করেন, এবং ভগবৎপ্রসাদে কাম্যবস্তু সকল প্রাপ্ত হন (গীতা ৭।২২)। কিন্তু—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

গীতা—৭।২৩।

সেই অল্পবুদ্ধিদিগের যে যে ফল লাভ হইয়া থাকে তাহা বিনাশশীল অর্থাৎ কথনও না কখন তাহার শেষ হইবেই। দেবযাজিগণ সেই

বিনশ্বর দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন, ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। কোন প্রকার কামনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহার যে ফল নাই তাহা নয়; যে ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিতগণ কামনার বশীভূত হইয়া যজ্ঞশেষসোমপান পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহাপবিত্র দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে নানাপ্রকার দিব্যভোগ উপভোগ করেন, কিন্তু সেই ভোগ সকল সর্ব্বকালস্থায়ী হয় না; তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সুবিশাল তৈজসলোক সকল ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার এই মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ভোগকামনার বশবর্ত্তী হইয়া বৈদিক কর্ম্মের অনুকরণ করিলে এই প্রকার ভোগলালসাশীল হইয়া যাতায়াতই করিতে থাকেন অর্থাৎ জন্মমৃত্যুমার্গই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (গীতা ৯।২১)। অপরপক্ষে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃপর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

গীতা—৯।২২।

মদ্ব্যতীত অন্যকামনাবিহীন যে ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিয়া আমার উপাসনা করে আমি সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ সেই ভক্তের যোগ (অপ্রাপ্তপ্রাপণ) ও ক্ষেম (প্রাপ্তরক্ষণ) বহন করিয়া থাকি। যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতাকে ভজনা করে তাহারা অবিধি পূর্ব্বক সেই ভগবানেরই পূজা করিতে থাকেন। অবিধি হেতু পূজার জন্য তাহাদিগকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবদুপাসনা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি পূর্ব্বক ভগবদুপাসনা যদি না করা হয় তাহা হইলে তাহা আর ভগবদুপাসনা নয়,

অন্য দেবতার পূজামাত্র। অন্য দেবতার পূজা করিলেও ভগবান সেই দেবোপাসনাতে শ্রদ্ধা প্রদান করেন ও ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন। সুকৃতি সম্পন্ন সৎলোকে ভগবানকে উপাসনা করিলে ভগবান ত তাহার যোগক্ষেম বহন করিবেন; এমন কি যদি সুদুরাচার ব্যক্তিও ভগবানকে ভজনা করাই একমাত্র প্রয়োজন স্থির করিয়া ভগবানকে আমার স্বামী, আমার গুরু, আমার সুহৃৎ, বা আমার ভোগ্য এইরূপ মনে করিয়া ভজনা করে, সত্যনিশ্চয় সম্পন্ন হওয়াতে তাহাকেও সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেও ভগবানের প্রসাদে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় ও শাশ্বত শান্তি লাভ করে, যেহেতু ভগবদ্‌ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হয় না। ভগবদুপাসনা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় নিত্য, ভগবদুপাসনার সময় অসময় নাই, কালাকাল নাই, সকল সময়ে সকল স্থানে ভগবদুপাসনা ও ভগবদ্ভাবনা করা যায় এবং সকল স্থানে ও সকল সময়ে ভগবদুপাসনা করাই কর্ত্তব্য। সাধ্বী মহিলা কোন সময়ে না প্রবাসস্থ স্বামীর চিন্তা করেন? মাতা কোন সময় না প্রবাসস্থ সন্তানকে স্মরণ করেন? কোন এক বিশেষ সময়ে বা স্থানেই যে উপাসনা করা যাইতে পারে অপর স্থানে যে পারে না তাহা নয়, স্থান বা সময়ের উপর নির্ভর করিয়া উপাসনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মৃত্যু বা বিপদ সন্নিকটস্থ ভাবিয়া ভগবদুপাসনা ও ভগবানকে পূজা করা নিকৃষ্ট। কথিত আছে যে অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক যিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন তিনি ভগবানকে পান; যেহেতু মৃত্যুকালে যাহার মনে যে ভাবের উদয় হয় সে মৃত্যুর পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় (গীতা ৮।৬)। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামীলের উপাখ্যানে অতি সুন্দররূপে ঐ ভাবটি প্রকাশ করা আছে। এই কারণবশতঃ পাছে সন্দেহ হয় যে কেবলমাত্র মৃত্যুকালেই ভগবৎস্মরণ করাই যথেষ্ট সেই হেতু গীতাতে অনুশাসন আছে—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥
গীতা ৮।৭

"সেই হেতু সকল সময়েই আমার উপর সংকল্প ও অধ্যবসায় লক্ষণবিশিষ্ট অন্তঃকরণকে সমাধান পূর্ব্বক আমাকেই অনুস্মরণ কর, তাহা হইলে যথাভিলষিত প্রকার আমাকেই পাইবে এ বিষয়ে সংশয় নাই।" মহাত্মা রামানুজ তদীয় ভাষ্যে 'তস্মাৎ' এই পদের ব্যাখ্যাকালে ভগবানকে সকল সময়েই স্মরণ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "পূর্ব্বকালাভ্যস্ত বিষয়েই অন্তপ্রত্যয় হয়, সেই হেতু সকল সময়েই ভগবৎস্মরণ করিতে হইবে"। শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে তাঁহাকে সকল সময়েই স্মরণ করিতে হইবে। ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমুদায় সমর্পণ করিতে হইবে। তপ বা যজ্ঞানুষ্ঠান যে কার্য্য করিবে তাহা সমুদায়ই ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে (গীতা ৯।২৩)।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ১১।২।৩৬

ভগবানের নাম লইয়া খেলা করা কিম্বা ছলনা করাকে যথার্থ ভজনা বলে না। সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে প্রকৃত উপাসনা করা হয় না। নিজের নিজত্বটুকু রাখিয়া পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা যায় না।

উপনিষদের মধ্যে ভক্তির ভাব যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, উহা গীতায় পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। উপনিষদের "রসো বৈ সঃ" "প্রাণস্য প্রাণঃ"

"আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জাতানি" ইত্যাদি মহাভাব সকল গীতা ও ভাগবতে অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট ভাবে প্রকটিত আছে। গীতার ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা, উহা ভাগবতে নির্গুণ ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও কারণ শূন্যা ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে যে পর্য্যন্ত না মন আপন হইতে শান্ত হয়, তাবৎ সমগ্র অঙ্গবিশিষ্ট ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান করিবে (৩।২৮।১৮)। উক্ত প্রকার সাধনার নাম সাবলম্বন যোগ। এইরূপ ধ্যান করিলে আপনার হৃদয়াকাশে ভগবান্ যখন জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইবেন তখন প্রেমরসাপ্লুত ভক্তিবলে তাঁহারই প্রতি মন অর্পিত হইবে। তখন তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করে না। এই প্রকারে ধ্যানাসক্তিতে হরির প্রতি যোগীর প্রেম সঞ্চার হয়, ভক্তিভরে হৃদয় গলিয়া যায় এবং প্রেমে অঙ্গ পুলকিত হয়।

ভক্তিশাস্ত্রসকলের মতে ভক্তিপথ গৌণ পথ নয়, মুখ্য পথ। ভগবদ্গীতা ও শাণ্ডিল্যসূত্রের মতে ভক্তির জন্য যোগ প্রয়োজন। যোগ গৌণ পথ, ভক্তি মুখ্য পথ (গীতা ১৪।৯; শাণ্ডিল্যসূত্র ১৯, ২০)। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকদিগের মতে ভক্তি বা সগুণব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র উচ্চ ফল লাভ হয়। পূজ্যপাদ মহাত্মা মধুসূদন সরস্বতী তৎকৃত গীতার টীকায় দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফল অবিদ্যানাশ ও মুক্তি বটে, কিন্তু সগুণব্রহ্মবিদ্যার ও ভক্তিসাধনের ফল পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাই—নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা ধ্যান পূর্ব্বক অবিদ্যাপ্রপঞ্চভূত সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ। অদ্বৈতবাদিদিগের মতে ভক্তির ফল নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা। ভক্তি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ও ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যাবতীয় প্রপঞ্চ দূরীভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থাতে, যদি তাহাকে অবস্থা বলা যায়, অর্থাৎ স্বস্বরূপে

অবস্থিতি কালে, ভক্তি বা অপর কোন দ্বৈত ভাব থাকে না। যাহা হউক গীতাতে —অন্ততঃ মূলগ্রন্থে উক্ত ফলবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না. গীতার মতে ফল ও সাধনা একই। সাঙ্খ্য বা জ্ঞানপথে যে স্থানে যাওয়া যায় যোগ দ্বারাও সেই স্থান পাওয়া যায়।

তথাচ গীতা ৫।৫

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।

সাংখ্য. যোগ. ও ভক্তি এ সকলের ফল এক হইলেও ইহাদের মধ্যে যে কোন ইতর বিশেষ নাই তাহা নয়। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে প্রশ্ন করিলেন। “সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা তোমাতে নিষ্ঠাবান্ যে সকল ভক্ত তোমাকে ধ্যান করত উপাসনা করেন আর যাহারা অব্যক্ত অবিনাশি ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদের মধ্যে কে অধিক যোগবিৎ? এতদুত্তরে ভগবান বলিলেন ‘অব্যক্তাসক্ত-চেতাদের ক্লেশ অধিক এবং সততযুক্ত সাধকগণ অনায়াসেই মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পান।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়েঃ—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

অপর পক্ষে যাহারা দেহধারণার্থ ও যজ্ঞ দান হোম তপঃ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ভগবানে অনন্যযোগের দ্বারা ন্যস্ত করিয়া ভগবানকে ধ্যান অর্চ্চন প্রণাম স্তুতি কীর্ত্তনাদি সহিত তাহাকেই একমাত্র গতি মনে করিয়া উপাসনা করেন ভগবান সেই ভগবদর্পিতচিত্ত অনন্যভক্তদিগকে অচিরেই মৃত্যুসাগর হইতে উদ্ধার

করেন। অদ্বৈতমতাবলম্বী আচার্য্যগণ উক্ত শ্লোক হইতে ব্যাখ্যা করেন যে ভক্তিমার্গ দ্বারা মৃত্যুসাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় মাত্র, কিন্তু মোক্ষ বা অবিদ্যানাশ হয় না। মুক্তি বা অবিদ্যানাশ করিতে হইলে ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু মহাত্মা রামানুজ তাহার ভাষ্যে বলেন যে গীতার উক্ত শ্লোক দুইটির দ্বারা ঐকান্তিক অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই যুক্ততম বলা হইয়াছে।

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেও উক্ত আছে ঃ—

ভজন্তি যে বিষ্ণুমনন্যচেতস
স্তবৈব তৎকর্ম্মপরায়ণাঃ পরাঃ।
বিনষ্টরাগাদি বিমৎসরা নরা
স্তরন্তি সংসারসমুদ্রমশ্রমম্ ॥

অনন্যচিত্ত হইয়া যে ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ ভক্তগণ ভগবানকে ভজনা করেন, বিনষ্টরাগাদি বিমৎসর সেই লোকেরা শ্রম বিনা সংসারসমুদ্র পার হন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও কথিত আছে যে আত্মসমাহিত যোগবলের দ্বারা অপর যে মহাত্মসকল বরিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় পূর্ব্বক ভগবানে প্রবেশ করেন তাহাদের শ্রম হয়. কিন্তু যাঁহারা সেবা করিয়া ভগবানকে পান তাঁহাদের শ্রম হয় না।

তথাপরে চাত্ম সমাধিযোগ
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বরিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্নতু সেবয়া তে।৩।৫।৪৫

অসক্তবুদ্ধি বিগতস্পৃহ জিতাত্মা ব্যক্তি কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানত্যাগের দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥

গীতা ১৮।৪৯।

ঐকান্তিকী অহৈতুকী ভক্তি সম্বন্ধে গীতাতে বিশেষ ভাবে উপদেশ দেওয়া আছে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৮।

"আমাতেই মনঃসমাধান কর, আমার প্রতিই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর"। পুনরায় কহিলেন "যদি মনঃসমাধান করিতে না পার অভ্যাস কর, তাহাতেও যদি সমর্থ না হও আমার শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ কর।" গীতা ১২।৯, ১০, ১১। উক্ত সকল প্রকার সাধনাই ভক্তির অঙ্গ। ভক্তের চিত্ত কেবল ভগবানেই রত, ভক্তের প্রাণ ভগবানেই সমর্পিত। ভক্তগণ পরস্পর পরস্পরকে ভগবানের বিষয় বুঝাইয়া নিত্য ভগবানের কথা কহিয়া সন্তোষ ও আনন্দ প্রাপ্ত হন।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

গীতা ১০।৯,১০।

ভগবচ্চিত্ত, ভগবৎপ্রাণ, ভগবৎসম্বন্ধে পরস্পরের কাছে কথনশীল ভক্তগণ ভগবানেই নিত্য আনন্দ পান ও তাঁহাতেই নিত্য ক্রীড়া করেন। প্রীতি পূর্ব্বক ভজনাকারী সেই সততযুক্ত সাধকদিগকে ভগবান এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যাহাতে তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

অদ্বৈতবাদিগণ গীতার উল্লিখিত দশম শ্লোকের "বুদ্ধিযোগ" এই কথাটী আপনাদের সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে একনিষ্ঠ ভক্তি হইতে বুদ্ধিযোগ বা ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান লাভ হয় ও তদ্দ্বারাই ভগবানকে আত্মরূপে পাওয়া যায়। স্বামী ও রামানুজাচার্য্য "মামুপযান্তি" এই অংশের সাধারণ ভাবেই অর্থ করিয়াছেন "আমাকে প্রাপ্ত হয়". কিন্তু মহাত্মা শঙ্কর ও পূজনীয় মধুসূদন সরস্বতী সাধারণ অর্থে সন্তুষ্ট না হইয়া কহিলেন, "ভগবানকে আত্মরূপে প্রাপ্ত হন।" অদ্বৈতবাদিগণ এই প্রকার অনেক স্থলে বাক্যের অসাধারণ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করেন। মহাত্মা শঙ্কর তাহার বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে ভক্তিকে মোক্ষ-কারণসামগ্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"।৩২

কিন্তু "স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিঃ" এই কথা বলিয়া ভক্তির অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যাহা হউক মহাত্মা শঙ্করের কৃত স্তবগুলি দৃষ্টে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে তাঁহার ন্যায় অতি উচ্চাঙ্গের ভক্ত অতি অল্পই জন্মায়, কিন্তু গীতা উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বোধ হয় যে ভাষ্যকার যেন একজন স্বতন্ত্র মহাপুরুষ।

যে আকারের হউক না কেন, ভক্তিতে ভেদভাব আছেই; সুতরাং অদ্বৈতবাদে ভক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। জনৈক সাধু সেই হেতুই বোধ হয় বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা সাধনার সময় দ্বৈতবাদী, কিন্তু বিচারের সময় অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদসম্মত বিচারে আনন্দ পান বলিয়া ভক্তির বিমল আনন্দ ভোগ করিতে পারেন না।

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক জ্ঞান কাহাকে কহে তাহা উক্ত আছে,—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ১৮।২০

যে জ্ঞানের দ্বারা, এই বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের মধ্যে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনশীল সত্তা বা চিৎ স্বরূপ আত্মাই পরিদৃষ্ট হয় সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত কয়েকটীকে জ্ঞান বলা হইয়াছে তদ্ভিন্ন সমুদয়ই অজ্ঞান।

বিদ্যমান কিম্বা অবিদ্যমান গুণ দ্বারা আত্মশ্লাঘা না করা রূপ অমানিত্ব, লাভ বা পূজাখ্যাতির জন্য স্বধর্ম্ম প্রকটন না করা রূপ অদম্ভিত্ব, কায়মনো-বাক্য দ্বারা কোন প্রকার প্রাণীর হিংসা না করা রূপ অহিংসা, নির্ব্বিকার চিত্তে ক্ষমতা সত্ত্বেও অপরের কৃত অপরাধ সহ্য করা রূপ ক্ষান্তি, আচার্য্য সেবা, সরলতা, বাহ্যাভ্যন্তর শুচিত্ব, মোক্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে অনেক প্রকার বিঘ্ন পদে পদে উপস্থিত হয় সেই সকল পরিত্যাগ করার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্নাধিক্য বা স্থৈর্য্যরূপ আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় ভোগে অনুরাগবিরোধিনী অস্পৃহাত্মিকা বৈরাগ্যনাম্নী চিত্তবৃত্তি, গর্ব্ব হীনতা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা ইষ্ট বিয়োগ ও অনিষ্ট সংযোগ ও আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক দুঃখাদির বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা, স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে প্রীতি ত্যাগ, পুত্র দারা-দির সুখে আমি সুখী তাহাদের দুঃখে আমি দুঃখী এই ভাব রাহিত্য বা সমচিত্ততা, অর্থাৎ ইষ্ট প্রাপ্তিতে আনন্দ বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দুঃখ বোধ না করা, ভগবানের প্রতি অনন্যযোগ ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, সাধনানুকূল সর্পব্যাঘ্রাদি শ্বাপদাদি রহিত অরণ্য নদীপুলিন দেবগৃহাদি বিবিক্তদেশসেবিত্ব; প্রাকৃতজনসভার সঙ্গ করিতে অনিচ্ছা,

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন এই কয়টীই জ্ঞান; এতদ্ব্যতীত সবই অজ্ঞান। এই গুলিই ভক্তির অঙ্গ, ইহাদের লইয়াই বুদ্ধিযোগ।

কোন আধুনিক ভক্তিগ্রন্থে উক্ত আছে ঃ—

সেই বিদ্যা যাথে হরি ভক্তির লক্ষণ।
অবিদ্যা সকল কৃষ্ণ বিনু শাস্ত্রে কহে॥

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী মহাত্মা বলদেব বিদ্যাভূষণ তদীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন "ঈশ্বর বৈমুখ্যই সংসৃতি হেতু" তাহাই অবিদ্যা।

শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে নামসঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবন এই দু'য়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণ পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গ, নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেবা করাই বৈষ্ণব মতে পঞ্চাঙ্গ সাধন। গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন, ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবপূজন, সেবা, নামাপরাধবর্জ্জন, অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগ, বহুশিষ্যবর্জ্জন, বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, হানিলাভসমজ্ঞান, শোকাদির বশীভূত না হওয়া, অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু বা বৈষ্ণব নিন্দা বা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনা, প্রাণিমাত্রের মনের মধ্যে উদ্বেগ না দেওয়া, শ্রবণ, স্মরণ, পূজন, পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহগতি, পরিক্রমণ, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন, ধূপ মাল্য গন্ধ, মহাপ্রসাদ ভোজন, আরো-রাত্রিক মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, নিজ প্রিয় দান, ধ্যান ও তদীয় সেবন এই কয়টী বৈষ্ণব মতে ধর্ম্মের চতুঃষষ্টি অঙ্গ। রামানুজমতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ অভিগমন অর্থাৎ শ্রীমন্দিরাদি পরিষ্করণ, উপাদান অর্থাৎ পুষ্পাহরণ ইত্যাদি, উপাসনা, স্বাধ্যায় বা মন্ত্র জপ, ও যোগ বা ভগবচ্চিন্তা, এই কয়টীকে পঞ্চাঙ্গ সাধন কহেন; এবং নিম্নলিখিত

কয়েকটীকে ভক্তিসাধনের সহকারী বলিয়াছেন,—বিবেক, বিমোক্ষ, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ অর্থাৎ সত্য সরলতা দয়া দান অহিংসা অনভিধ্যা অর্থাৎ পরকৃতাপরাধচিন্তারাহিত্য, অনবসাদ, অনুদ্ধর্ষ।

মহাত্মা শাণ্ডিল্য ভক্তির নিম্নোক্ত কয়টি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ—সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, ইতরবিচিকিৎসা, তদীয়তা সর্ব্বতদ্ভাব ও অপ্রাতিকূল্য। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি মহান্ ও মিষ্ট। উক্ত ধর্ম্মমতের কর্ম্মসাধনবিধি বৌদ্ধমতসম্মত কার্য্য সাধন বিধি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ নয়, তবে উহার মধ্যে অনেক স্থলে আচারকেও ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভক্তিমার্গের একটী অংশ মাত্র এবং উহাকেই একমাত্র ভক্তিমার্গ মনে করা উচিত নয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মে কথিত ভক্তি ও তজ্জাত কর্ম্ম সাধন যে একমাত্র বৈষ্ণব মতেরই নিজস্ব তাহা নয়। উহার মধ্যে অনেক গুলি ভক্তি পথের সাধারণ সম্পত্তি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কথিত আছে,—

> কৃষ্ণ ভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর হীন।
> কৃষ্ণ প্রেম সেবাপূর্ণ আনন্দপ্রবীণ॥

কেবলই যে বৈষ্ণব মহাত্মা দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন তাহা নয়; যেখানে যে দেশে যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, ভক্ত মাত্রেই সদানন্দ ও নিস্পৃহ। যিনি আনন্দ স্বরূপ ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আর নিরানন্দ কোথায়? তাঁহার আর আকাঙ্ক্ষা করিবার কি থাকিতে পারে?

তবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুই একটী বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ ভক্তি-মার্গ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ধর্ম্মানুশীলন ও বহিরঙ্গসাধন মানব জাতির ধর্ম্মের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতেই বহুল পরিমাণে

প্রবর্ত্তিত হয়। স্বামিভাবে ভগবানকে উপাসনা করিবার সঙ্কেত বোধ হয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিজস্ব। বৈষ্ণব মতে হৃদয়ে ভাব ও প্রেম না থাকিলেও সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। নাচিতে না জানিলেও নাচিতে হইবে। গাইতে না জানিলেও গাইতে হইবে। প্রেমহীন অন্তঃকরণে ভগবানের নাম লওয়া কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে অনুচিত। কিন্তু বৈষ্ণব মতে প্রেমহীন অন্তঃকরণে সঙ্কীর্ত্তন করিলে হৃদয়ে প্রেম উৎপন্ন হইবে। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ভগবানকে ভক্তের হৃদয়ের কাছে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আনে।

নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ মন্ত্রবৎ॥

শ্রীবৃহদ্ভাবতামৃত ২।৩।১৪৭

কিন্তু বৈষ্ণবদিগের ঐ মতটী ভক্তিমার্গাবলম্বিদিগের সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস নয়। বৈষ্ণবপদাবলীতে উক্ত আছে যে সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশ, চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্ব ভক্তিসাধনউদ্গম, কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন, কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবা সমুদ্রে নিমজ্জন প্রভৃতি ক্রমশঃ হইতে থাকে।

"যেই সদা করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন
ভোগোন্মুখ পাপক্ষয় হয় ততক্ষণ"। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিকে নিম্নোক্ত কয়টী লক্ষণ বিশিষ্ট বলা হইয়াছে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥৭।৫।২৩

নারায়ণ কথা যেমন লোকপাবন যাবতীয় তীর্থে অবগাহন, সকল আশ্রমাভিগমন তেমন পাবন নয়।

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা ফলদং সৌতে নারায়ণকথা যথা॥

(মহাভারত শাঃ মোক্ষঃ অঃ ৩৪৫)

শ্রদ্ধার সহিত নিত্য ভগবৎকথা শ্রবণ করিলে অতি অল্প কালের মধ্যেই ভগবান হৃদয়ে প্রকাশ পান। ভাগবতে পরীক্ষিৎ বলিলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান বিশতে হৃদি॥ ২।৮।৪

যেমন সূর্য্যের প্রকাশ মাত্রেই অন্ধকার বিদূরিত হয়, প্রবল বায়ু উত্থিত হইলে মেঘ চলিয়া যায়, সেই প্রকার অনন্ত ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্যমাণ হইলে সেই নাম হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয়স্থ দুঃখ ও পাপ নষ্ট করে।

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

ভাগবত ১২।১২।৪৮

অগ্নি যেমন ধাতু গলাইয়া দেয় সেই প্রকার ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও বিলপন অশেষ পাপ গলাইয়া দেয় ও নষ্ট করে।

যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ অং ৬ অ ৭ শ্লোক ১।

হরিস্মরণে হৃদয়ের যেমন আত্যন্তিক শুদ্ধি হয়, বিদ্যা, স্বধর্ম্মাচরণ,

প্রাণায়াম, জীবে দয়া, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতিতে তেমন হয় না।

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

ভাগবত ১২।৩।৪৮

শাস্ত্রকারেরা বলেন যে একবার মাত্র হরি স্মরণে যত পাপ দূরীভূত হয় তত পাপ মানবে শত জীবনে করিয়া উঠিতে পারে না। একবার মাত্র স্মরণ করিলেই পাপ নষ্ট হয় বটে কিন্তু একবার মাত্র স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়, তাঁহাকে ক্ষণমাত্রও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ১২।১২।৫৫

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃতি পাপ সকল নাশ করে, মঙ্গল করে, এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, আত্মানুভবরূপ বিজ্ঞান, এবং বিষয়বিতৃষ্ণাযুক্ত শাস্ত্রীয় জ্ঞান উৎপাদন করে। হরিভক্তি-সুধোদয় গ্রন্থে মহাত্মা নারদ বলিলেনঃ—জিহ্বা পাইয়াও যে ভগবৎ কীর্ত্তন না করে সে দুর্ম্মতি মোক্ষারোহণ সোপান পাইয়াও আরোহণ করে না। সেই হেতু যে ব্যক্তি আনন্দরসসুন্দর গোবিন্দমাহাত্ম্য নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন তিনি কৃতার্থ।

জিহ্বাং লব্ধ্বাপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ।
লব্ধ্বাপি মোক্ষনিঃশ্রেণীং স নারোহতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৮।৫
তস্মাদ্গোবিন্দমাহাত্ম্যমানন্দরসসুন্দরম্।
শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥ ৮।৬

বৈষ্ণব মতেও নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি বহিরঙ্গসাধন, এবং রসাস্বাদন বা উপলব্ধি অন্তরঙ্গসাধন। সজনে সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ প্রভৃতি বহিরঙ্গ সাধন ও নির্জ্জনে অন্তরঙ্গ সাধনই বিধি। বহিরঙ্গ সাধন হইতে রসাস্বাদন বা অন্তরঙ্গ সাধনের উৎপত্তি হয়। কেহ কেহ বলেন একাকী বা নির্জ্জন প্রদেশেই ধ্যান সিদ্ধ হয়, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন নির্জ্জন প্রদেশে, বহুসঙ্গে সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠেয় ও সিদ্ধিপ্রদ।

পূর্ব্বে একস্থানে বলা হইয়াছে যে প্রাণে ব্যাকুলতা না জন্মাইলে অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার না হইলে বাহ্য আচার অনুষ্ঠান কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদি ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন কি প্রাণে ভক্তির সমাবেশ না হইলে ভগবানের নাম পর্য্যন্ত করাও ঔদ্ধত্য মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ভক্তিসাধন সম্পূর্ণভাবে অন্তর্মুখ হইলেও বহিরঙ্গসাধন দ্বারা ভক্তি বাহির হইতে হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করে,সুতরাং বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ বা অপর কোন প্রকার বহিরঙ্গ সাধন পরিত্যাজ্য নয়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভক্তিহীন মানবের হৃদয়ে নিয়মিত বহিরঙ্গসাধন দ্বারা ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হইতেছে। অনেক সময় যে মানবের হৃদয়ে ভক্তি নাই, সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবার কিছু পরেই তাহার প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়, পরে আবেগ ও ব্যাকুলতা আসিয়া পড়ে। অনেকেই জানেন যে আরাত্রিকের পূর্ব্বে প্রাণ অত্যন্ত

নীরস, কিন্তু আরাত্রিকের সময় বাহ্যানুষ্ঠান দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় ভক্তি-রসে আপ্লুত হয়। সকলেই উক্ত সত্যটী হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন ও করেন। তীর্থদর্শন, সঙ্কীর্ত্তন, উৎসব প্রভৃতি সমুদায়ই বাহিরের সাধন এবং এই বহিরঙ্গসাধনসকলের দ্বারা মানবহৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হয়। ভক্তি যেমন হৃদয়ের ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ পায় সেইরূপ বাহির হইতে অনুকূলচিত্তের ভিতরেও প্রবেশ করে, সুতরাং বাহ্য সাধন সাত্ত্বিক ভাবে অবশ্য আচরণীয়। কিন্তু সদা সর্ব্বদা এই জ্ঞানটী থাকা বিশেষ প্রয়োজন যে ভক্তিসাধন হৃদয়ের জিনিষ, বাহিরের নয়, বাহিরের যাহা কিছু তাহা হৃদয়কে সাহায্য করে মাত্র। বাহ্য সাধনকে উচ্চ স্থান ও উপলব্ধি প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনকে নিম্নস্থান দেওয়া গর্হিত কার্য্য। ধর্ম্মধ্বজী হইয়া বহিরঙ্গসাধন গর্হণীয়। বাহ্য সাধন প্রকৃত উপাসনাই নহে সাহায্য মাত্র।

ভগবানের উপাসনাতে স্পৃহা নাই, ভক্তিতে আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রেমে অভিলাষ নাই। ভক্ত প্রেমিকও সদাই নিস্পৃহ ; তাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন বাসনা নাই, তিনি কিছুই চান না। স্পৃহা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিতে ভক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হইতে পারে না। পার্থিব ভালবাসাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যতক্ষণ হৃদয়ে বাসনা আছে ততক্ষণ ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ হয় না। যেখানে স্পৃহার লেশমাত্র আছে সেখানে প্রেম নাই। ভক্তি ও স্পৃহা কখনও এককালে একস্থানে থাকিতে পারে না। প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় একত্র থাকিতে পারে কিন্তু প্রেম ও স্পৃহার একত্র স্থিতি অসম্ভব। সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে সকল প্রকারের বাসনাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাসনাই বন্ধের কারণ, বাসনা হইতেই যাবতীয় দুঃখের উৎপত্তি। অনাদিবাসনাপ্রবাহই জন্ম ও মৃত্যু ঘটিত সংসারচক্রের

মূল। বাসনাই একমাত্র নিগড়। কোন প্রকার বাসনা থাকিতে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি হওয়া দুরূহ। গীতাতে সেই হেতু পুনঃপুনঃ নিষ্কাম ভাবে বা ভগবানের উপর কর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ইষ্টা পূর্ত্তাদি কর্ম্ম করিবার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মনু-সংহিতাতেও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি বিশেষ ভাবে কথিত আছে। সেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেখিতে পাওয়া যায় যে নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বাসনা বা স্পৃহাই সংসারস্থিতি ও তদ্ধেতু দুঃখের একমাত্র কারণ। মহাভারতে কথিত পিঙ্গলা বারাঙ্গনার উপদেশের ন্যায় বৌদ্ধশাস্ত্র মতে বাসনানাশই দুঃখনাশের উপায়; বৌদ্ধ মতে রূপস্পৃহা এমন কি অরূপস্পৃহা পর্য্যন্তও পরিত্যাজ্য। বর্ত্তমান দেহ ধ্বংসের পর কোন প্রকার শরীরী সত্তা পাইবার ইচ্ছা রূপস্পৃহা, ও বর্ত্তমান দেহের ধ্বংসের পর কোন প্রকার অশরীরী বিমল সত্তা পাইবার বাসনা অরূপস্পৃহা। সকল প্রকারের আকাঙ্ক্ষা এমন কি উক্ত দুই প্রকারের স্পৃহা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য (কেতোখিল সূত্র)। নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধের পক্ষে নিরবলম্বন হইয়া গতস্পৃহ হওয়া অত্যন্ত দুরূহ, সেই হেতু বৌদ্ধধর্ম্মে চতুর্ব্রহ্মবিহারসাধন অর্থাৎ দয়া ভালবাসা সহানুভূতি ও সাম্য এই কয়টী সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভগবানকে ভালবাসা ব্যতীত চতুর্ব্রহ্মবিহারসাধনও সহজ নয়। ভক্তিপথে প্রেমিক যখন ভগবানকেই একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ বোধ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করতঃ তাঁহাকে ভালবাসেন তখন তাঁহার পক্ষে সকল প্রকারের স্পৃহাহীন হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। বিগতসংসার-স্পৃহ হওয়াই শান্তিপথ; কিন্তু ভক্তিমার্গে ইহা যত সহজ ও স্বাভাবিক, বিশুদ্ধ কর্ম্মমার্গে অর্থাৎ মহাত্মা বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত মধ্যপথাবলম্বনে বা জ্ঞানমার্গে তত নয়। ভগবদুপাসনার সময় অর্থাৎ ভগবদুপলব্ধি, ধ্যান

ও ধারণার সময় হৃদয়মধ্যে স্পৃহাস্বরূপ কোন প্রকার মালিন্য থাকা উচিত নয়। প্রার্থনা কালে স্পৃহা থাকা অনুচিত হইলেও নিতান্ত দোষের নয়; যেহেতু স্পৃহার সহিত প্রার্থনাই সকাম উপাসনা। প্রার্থনা কালীন স্পৃহা সাত্ত্বিকী স্পৃহা হওয়া উচিত। নিষ্কাম উপাসনার ন্যায় উচ্চ অঙ্গের না হইলেও সকাম উপাসনা ভগবানের কাছে গ্রাহ্য। ভগবান্ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট সকাম সাধকের কামনা পূর্ণ করেন। স্পৃহাহীন হইয়া ভগবানের উপাসনা এমন কি নিষ্কাম প্রার্থনাও সংসারে বিরল। "ভগবন্, আমাকে অমুক দাও, ভগবন্, আমার শত্রু নিপাত কর", এই প্রকার আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রার্থনা ও ভগবৎপূজন সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু ঐ প্রকারের পূজা ভক্তিসাধনের অঙ্গ হইতে পারে না; উহা প্রকৃত ভগবদর্চ্চনা নয়। ভগবন্ আমাকে রক্ষা কর এ প্রার্থনা মানব-জীবনের স্বাভাবিক, কিন্তু রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশোদেহি, দ্বিষো-জহি, এবম্ভূত প্রার্থনা বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনের অঙ্গ হইতে পারে কিনা সন্দেহ। কাতর ভক্ত কষ্টের সময় বলিতে পারেন "দেবি প্রপন্নার্ত্তি-হরে প্রসাদ, প্রসাদ মাতর্জগতোঽখিলস্য" কিন্তু "বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু" এ প্রার্থনা খুব সাত্ত্বিক হইলেও সকাম। যাহা হউক, সকামই হউক আর নিষ্কামই হউক, সাত্ত্বিক উপাসনা বা সাত্ত্বিক প্রার্থনা কখনও হেয় নয়। তবে নিষ্কাম অবিচ্ছিন্নমনোগতি উপাসনাই প্রকৃত ভক্তিসাধন।

লৌকিক প্রেমেও দেখা যায় যে প্রেমিক প্রেমাস্পদকে কোন আকাঙ্ক্ষার সহিত ভালবাসে না। ভাল বাসিতে হয় তাই ভালবাসে, ভাল না বেসে থাকিতে পারে না তাই ভালবাসে। নদীর জল যেমন সমুদ্রের দিকে না গিয়া থাকিতে পারে না, সেই প্রকার অবিচ্ছিন্ন-মনোগতি ভক্ত ভগবানকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না,

তাই ভাল বাসেন। প্রকৃত প্রেম নিষ্কাম, কারণজ্ঞানশূন্য। ইহাতে স্বকীয় ভাব বা পরকীয় ভাবের ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৈবকীর ভালবাসায় কামনার ছায়ামাত্রও ছিল না। যশোদা দেবীও যে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিতেন তাহাতে পরকীয় ভাবের গন্ধমাত্রও ছিলনা। যশোদা দেবী ত জানিতেন না যে শ্রীকৃষ্ণ তাহার গর্ভজ সন্তান নহেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি যশোদার প্রেমও পরকীয় ভাবের হইতে পারে না। মা সন্তানকে কেন ভালবাসেন তাহার কারণ কেহ কি বলিতে পারে? তিনিই কি পারেন? ভগবানের প্রতি এই প্রকারের অহৈতুক ভালবাসা ও সেই ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের সহিত ভগবানের কার্য্য অনুষ্ঠানই ভক্তিসাধন। যখন বিশুদ্ধ লৌকিক প্রেমেই স্পৃহার লেশ মাত্র থাকে না, যখন লৌকিক প্রেমেই স্পৃহা থাকিলে প্রেম গাঢ়ত্বহীন হয়, তখন ভগবৎপ্রেমে আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র ত থাকিতে পারে না ও থাকা উচিত নয়। সাধনপথে বা ধর্ম্মজীবনে সকল প্রকারের আকাঙ্ক্ষাই মহাশত্রু, কাম ক্রোধাদির ন্যায় সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। সেই হেতু গীতাতে অনুশাসন আছে "সংকল্পজাত সকল প্রকার কাম নিঃশেষে পরিত্যাগ করতঃ ভগবচ্চিন্তা করিতে হইবে।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরে অনুরাগকে ভক্তি কহে। লৌকিক ব্যবহারেও দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহার যাহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ আছে সে সর্ব্বদা তাহার সেই প্রেমাস্পদকে নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করে, সর্ব্বদা তাহার সম্বন্ধে শুনিতে ইচ্ছা করে, সর্ব্বদাই তাহার কথায় প্রাণে আনন্দ বোধ করে। যেখানে তাহার সম্বন্ধে কথা হয়, সেই খানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তাহার নিন্দা প্রাণান্তেও শুনিতে পারে না, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, দেখিবার জন্য প্রান ব্যাকুল হয়, কি কার্য্য করিলে সে আনন্দিত বা সুখী হইবে তাহা করিতে ইচ্ছা হয়, এবং সেই

ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে সেই অভিলাষ অনুযায়িক কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার জন্য প্রাণ সদাই যেন কাঁদিতে থাকে, তাহার নাম শুনিলেই যেন সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে থাকে,—

"কানু নাম শুনি, চমকি উঠহ, পুলক তাহার সাথী।"

নিত্যই তার মূর্ত্তি হৃদয়ে যেন গাঁথা থাকে, তাহার অস্তিত্ব সকল সময়েই প্রাণে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা হয়। ভগবদ্ভক্ত সাধুর অনুরাগের উল্লিখিত সমুদায় লক্ষণগুলিই প্রকাশ পায়; প্রেমিক সাধক সদাসর্ব্বদা ভগবানের কাছে থাকিতে ভালবাসেন; সদাসর্ব্বদা ভগবানের কাছে প্রাণের কথা জানাইবার জন্য ব্যস্ত হন; সতত তাঁহাকে প্রাণের ভিতর রাখিতে ইচ্ছা করেন; সদাসর্ব্বদা তাঁহার সম্বন্ধে শুনিতে ইচ্ছা করেন। যেখানে ভগবানের কথা হয় সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না, যাইতে হইলে প্রাণে কষ্ট হয়; ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, নিমেষমাত্রও যেন তাহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না; এক নিমেষের বিচ্ছেদ বোধ হয় যেন একযুগ। "তিল এক হয় যুগ চারি"।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

গোবিন্দ বিরহে প্রেমিকের নিমেষকে যুগ বিশেষ বোধ হয়, চক্ষে বর্ষাকালের ন্যায় বারিধারা আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি সমুদায় জগৎ যেন শূন্য বলিয়া বোধ হয়।

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥

এই অবস্থাকেই মহাত্মা নারদ পরমবিরহাসক্তি বলিয়াছেন। ভগবদ্বিরহে কাতর হইয়া ভক্ত তাহার ভগবানকে তাহার বুকের ভিতরে রাখিতে চান। ভক্ত গোবিন্দদাস বলিলেন,—

কানু বিনে জীবন, জ্বলত হি অনুক্ষণ,
কো সহু এ হেন সন্তাপ।
ও মুখ সমুখে ধরি, নয়ান অঞ্চল ভরি,
পিবইতে জীউ করে সাধ॥

বিস্মরণে ব্যাকুলতা ভক্তির লক্ষণ। মহাত্মা নারদ বলিয়াছেন,—

"তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা"।

তাই ভক্ত বলেন,—

"তিলেকে মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে,
শয়নে স্বপনে বন্ধু।"

কৃৎস্ন ক্রিয়াকলাপ ভগবানে অর্পিত হওয়াতে কি কাজ করিলে ভগবান্ আনন্দিত হবেন তাহা করিতে প্রেমিকের সদাই প্রবল ইচ্ছা হয়, এবং তিনি সেই কার্য্য করিতে থাকেন। ভগবানের সহিত বিচ্ছেদই দুঃখ, সংযোগই সুখ, এই ধারণা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে অপর কোন প্রকার ইষ্ট বিয়োগে বা অনিষ্ট সংযোগে প্রেমিকের প্রাণ ক্ষুব্ধ হয় না। ইচ্ছার অনুকূল ঘটনাই সুখের কারণ, প্রতিকূল ঘটনা দুঃখের কারণ। ভগবানের সহিত সংযোগ ভিন্ন প্রেমিকের আর কোন বাসনা না থাকাতে প্রেমিকভক্ত ভগবানকে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে না পাইলেই দুঃখ পান। প্রেমিক ভগবদ্বিরহে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। প্রেমিক উপলব্ধির কালেতেও তন্ময়—বাহ্যজ্ঞানহারা।

"কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।

হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করো,
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥”

ভগবদ্বিরহে মহাত্মা চৈতন্যদেব পাগলের মতন হইয়া বলিলেন,—

“কারে পুছোঁ কে কহে উপায়, হা হা সখি কি করি উপায়!
কাঁহা করো, কাঁহা যাঁউ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঁউ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥”

পরে ভগবানকে সম্বোধন করিয়াই যেন বলিলেন,—

“কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই।”

প্রবাসী স্বামীর জন্য সাধ্বী স্ত্রী যে ভাবে ভিতরে ভিতরে কাতর হন, তাহার জন্য যে প্রকার দিবারাত্র ভাবেন, ভগবানের জন্যও ভক্ত প্রেমিক সেই ভাবে ব্যাকুল। স্বামিসমাগমে যেমন পতিপরায়ণা সাধ্বীর আনন্দ ও উল্লাস, ভগবদুপলব্ধি কালেও প্রেমিকের সেই প্রকার আনন্দ ও উল্লাস। স্ত্রীলোকের স্বামিসমাগমে কিংবা প্রবাসস্থ স্বামীর জন্য যে ভাব হয়, তাহা যেমন অন্তর্মুখ ও চাপা, বাহিরে সহজে প্রকাশ পায় না, প্রেমিকেরও সেই ভাবের হওয়া উচিত ও সেই ভাবেরই হয়। আমার বিশ্বাস যে বহির্মুখ হইলে অর্থাৎ ভাবে পরিণত হইলে প্রেমের গাঢ়ত্ব, মিষ্টত্ব, ও গাম্ভীর্য্য সকলই কমিয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাই যে মহাত্মা চৈতন্যদেব তাঁহার ভাবের সময় সন্নিকটে অপর লোক থাকিলে আত্মসম্বরণ করিতেন। স্বরূপদামোদর বা রায়রামানন্দ ভিন্ন অপরের সাক্ষাতে তাঁহার প্রেম পূর্ণভাবে স্ফুরণ হইত না।

ভক্তি মার্গ অতি সুন্দর, অতি মহান্, ও বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ। ভক্ত বিশ্বের যাবতীয় পদার্থে, যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার উপাস্যের অনন্ত প্রেম অনন্ত স্নেহ দেখিতে পান। যাবতীয় সৃষ্টপদার্থই যেন তাঁহার

প্রেমাস্পদের প্রেমে পরিপূর্ণ; যেন সৃষ্টিই তাঁহার প্রেমের বিকার। ভক্ত তখন বলেন,—

"তোমাতে যখন, মজে আমার মন
তখনি ভুবন হয় সুধাময়।"

তিনি ভক্তের প্রাণধন। ভক্তের কাছে তাহার ঈশ্বর দূরে নন, নিকট হইতেও নিকট, প্রাণের প্রাণ, তিনি "প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর।" ভগবান আর তখন "অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি, অগম্য অগোচর" নন। ভগবান তখন আর বিশ্বেশ্বর নন, তাঁহার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, মনের মন। তাহার কাছে তাঁহার ভগবান কখনও পিতা কখনও মাতা কখনও স্বামী কখনও পুত্র কখনও বা কোন অনৈসর্গিক নিকটতম আত্মীয় হইয়া থাকেন। "তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে"। পার্থিব পিতা মাতা স্বামী সুহৃদ্ দেশকাল দ্বারা বদ্ধ ও সান্ত; কিন্তু এই অলৌকিক পিতা মাতা স্বামী সখা নিকটতম হইয়াও অনন্ত অনাবদ্ধ। তাই তাঁহার সহিত সম্বন্ধ যেন অনৈসর্গিক। ভক্তের কাছে ভগবান আর দূরাৎ সুদূরে, দূর হইতেও সুদূরে নন, তদিহান্তিকে, নিকট হইতেও নিকটে। মধুরভাবে সাধক বলিলেন "প্রাণ মাঝে বিরাজ প্রাণেশ আমার"। ভগবানের অনন্তত্ব, মাহাত্ম্য ভক্ত যেন সহিতে পারেন না। প্রেম যত গাঢ় হইতে থাকে ভগবান তত নিকটে হইতে থাকেন; প্রেমাধিক্যই ভগবানের মানবীকরণের মূলকারণ। সহস্রকোটী সূর্য্যমণ্ডলের পাতা স্রষ্টা নিয়ন্তা শক্তিস্বরূপ ভগবানকে ভক্ত ধারণা করিতে চায় না। তাঁহাকে সে চায়না, ভক্ত তাঁহার প্রাণের প্রাণকে চান। তাঁহার নিজের ভগবানকে চান। সেই হেতু ভক্ত বলেন,

"তোমার বিশ্বব্যাপী রূপ চাইনা মা দেখিতে,
দেখিছি মা তোরে, ঘটে পটে সর্ব্বভূতে"।

দাস্যভাবে উপাসনায় ভগবানের মহৎ ভাবের উপাসনার ব্যাঘাত হয় না। ভগবান মহান্ ও অনন্ত হইলেও উপাসনা বা প্রীতির ব্যাঘাত হয় না। শান্তরসের উপাসনায় অর্থাৎ আসক্তিবিহীন স্বরূপাস্বাদনে অনন্তত্ব ও সূক্ষ্মত্ব, নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব, অরস রস প্রভৃতি বিরুদ্ধগুণ একই সময়ে বর্ত্তমান; কিন্তু সেই স্বরূপাস্বাদনের ভাব গাঢ় হইলে রসো বৈ সঃ—ভগবান্ মূর্ত্তিমান্ প্রেম বা অনুরাগ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে প্রীতি সঙ্কুচিতা হয়, তাই মহাত্মা অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এ রূপে আর কায নাই, তুমি আমাকে তোমার সেই সৌম্য-মূর্ত্তি দেখাও, আবার সেই সখাভাবে উপস্থিত হও।" ভগবানের সৌম্য মানুষ রূপ দেখিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন কহিলেন "দেব! আমার চিত্ত স্থির হইল, আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।"

প্রেমিক প্রেমাস্পদকে সদাই কাছে রাখিতে চান, না পাইলেই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। সাধক তাহার প্রাণের প্রাণ ভগবানকে প্রাণের ভিতর রাখিতে চান। তিনি বলেন,—

"কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ"।
তাহার পর,—"হিয়ার মাঝারে, বসায়ে তোমারে,
হেরিব হে প্রেমমুখ"।

হৃদয়ের ভিতর ভগবানকে অনুভব করিতে করিতে যখন নৈকট্যবোধ অত্যন্ত গাঢ় হইয়া পড়ে, তখন মনে হয় "তোমায় আমায় একই পরাণ, ভালে সে জানি যে আমি। হিয়ার হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলে তুমি"॥ যাহা হউক 'আর তোমাকে চক্ষের আড়াল করিব না; আর তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।

"বন্ধু! আর কি ছাড়িয়া দিব?

হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণি,

সেখানে রাখিয়া দিব"।

ইহাই মহাত্মা নারদকথিত তন্ময়াসক্তি। প্রেমাস্পদকে প্রাণের কাছে আনাই প্রেমের লক্ষণ। নৈকট্যস্পৃহাই প্রেমের লক্ষণ, দূরত্বনাশ করাই প্রেমের কার্য্য।

শুদ্ধ ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়।

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।

সানুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

ইহাই প্রকৃত উপাসনা। প্রেমিকের সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা ভগবানের সেবা ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা নাই। তিনি কিছুই চাননা। স্বর্গাদি নশ্বর পদার্থের আকাঙ্ক্ষা দূরে থাকুক, তিনি যোগী ঋষিদের বাঞ্ছিতধন কৈবল্য বা মুক্তিও চাননা।

মৎসেবয়া প্রতীতাস্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥ ভাগবত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে একস্থলে কথিত আছে।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনোমম।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ ১১।২০।৩৪

ভক্ত মুক্তি চাননা, তাঁহার প্রেমাস্পদকে ভাল বাসিতে চান। তাঁহার প্রেমাস্পদকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে চান। ভক্ত বলেন,—

"আমি সব সমর্পিয়ে, একমন হ'য়ে,
হইব তোমার দাস।"

যাহাতে তাঁর প্রেমাস্পদের সুখ তাঁহাই তাহার সুখ, প্রেমাস্পদের প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম অর্থ কাম এমন কি মোক্ষও তাহার বাঞ্ছনীয় নয়। মোক্ষসুখ একরূপ; দুঃখের অত্যন্তাভাব বশতঃ যে সচ্ছন্দতা তাহাই কেবল মোক্ষেতে আছে, "দুঃখাভাব মাত্র সুখ মুক্তিতে আছয়", কিন্তু প্রেমভক্তির যে আনন্দ ও সুখ তাহা মোক্ষ অপেক্ষা অসংখ্য গুণ বেশী।

"ভক্তিতে ইন্দ্রিয়গণে বাহ্যান্তঃকরণে
কোটি চিত্তবৃত্তি বর্ত্তমান অনুক্ষণে" বৃঃ ভাঃ -২।১

ভগবদ্ভক্তি পথে মোক্ষাকাঙ্ক্ষা ও অন্তরায়। সেই হেতু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কথিত আছে,—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্ব সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণ॥

প্রেমিক মুক্তি চাননা, তিনি অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদকে সেবা করিতে চান। যাহাতে তাহার প্রেমাস্পদের প্রীতি ও আনন্দ হয় তিনি নিশিদিন সেই কাজ করিতে প্রয়াসী।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং নগৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভাগবত।৩।২৯।১১

তবে যদি সালোক্যাদি মুক্তি সেবার দ্বার হয় তাহা হইলে ভক্ত তাহা অঙ্গীকার করিতে পারেন। কিন্তু,—

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥"

ভক্তিশাস্ত্রানুসারে যত দিন ভুক্তি এমন কি মুক্তির স্পৃহাও হৃদয়ে থাকিবে তত দিন ভক্তি বা প্রেমের সম্যক বিকাশ হইবে না। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে উক্ত আছে,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও লেখা আছে,—

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

ভক্ত ভগবানকে ভাল বাসেন, কিন্তু কেন ভাল বাসেন তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার ভাল বাসিবার কোন কারণ নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই, ভাল বাসিলে প্রাণে আনন্দ হয় তাই তিনি ভাল বাসেন। ভক্ত ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেনা। ভক্তের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, ধর্ম্মে আস্থা নাই ঐশ্বর্য্যে নাই, কিছুতেই নাই, তাহার একমাত্র অভিলাষ যেন জন্মজন্মান্তরে ভগবৎপদে নিশ্চলাভক্তি থাকে। কেবলই যে বৈষ্ণব সাধক "মুক্তি চাইনা শ্রীহরি", এই কথা বলিয়াছেন তাহা নয়, শাক্তও তাই বলেন,—

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা নচ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা, শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।

অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥

ভক্ত বলেন, মা! আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমার মোক্ষ বাঞ্ছাও নাই, কেবল তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন আমি তোমার নাম করিতে করিতে মরিতে পারি। ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস তাই বলিয়াছিলেন ঃ—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়ানে দেখিমু তোমার চান্দ বদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ ॥

ঠাকুর নরোত্তমদাস ভগবদ্বিরহে কাতরে বলিয়াছিলেন,—

এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী ॥

ভক্ত ভগবানের পা দুখানি বুকে রাখিয়া ভগবানের প্রেমপূর্ণ বদন খানি দেখিতে দেখিতে ইহলোক ত্যাগ করিতে চান, ভগবানের পা দুখানি বুকে রাখিয়া ভগবানের প্রেমপূর্ণ চন্দ্রবদন খানি দেখাই তাঁহার আত্যন্তিক পুরুষার্থ। ভক্ত বলেন, ভগবন্! আমাকে উচ্চ নীচ যে কোন প্রকার জন্ম গ্রহণ করিতে হউক না কেন, তোমাতে আমার যেন অচলা অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে (পাণ্ডব গীতা)।

প্রেমিক বলেন,—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তি রচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

ভাগবতে বৃত্র বলিলেন,—

> ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
> ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
> সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
>
> ভাগবত ৬।১১।২৫

প্রকৃত ভক্ত ভগবানে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ করেন; তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলেই যেন ভক্তের শান্তি, আর কিছুতেই তিনি যেন শান্তি পান না। উক্ত প্রকারের অহৈতুক ঐকান্তিক অনুরাগই ভক্তি। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সাধ্য, ইহাই করণীয়।

> "প্রেমের সহিত ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ।
> স্বর্গাদির ভোগ আর মুক্তিও সুলভ॥ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত।

সেই হেতু,—

> "প্রেমভক্তিতে অজ্ঞের মতি নয়।
> দুঃখাভাব জ্ঞানে মোক্ষে প্রবৃত্তি জন্ময়॥"

এক্ষণে উক্ত প্রকারের অহৈতুকী ভক্তি ও ভগবানের উপর ঐকান্তিক নির্ভরের ভাব কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন হইলেই বা কিপ্রকারে স্থায়ী হয়। ভগবানের উপর স্থির আসক্তি করিতে হইলে, ভগবৎপ্রাণ হইতে হইলে কি প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ?

প্রায় সকল শাস্ত্রানুসারেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল সাধুসঙ্গ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ড ২২ অধ্যায় ও ভাগবত। ভক্তিরসামৃত গ্রন্থের প্রেম ভক্তিলহরীতে উক্ত আছে,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উক্ত শ্লোকটীর ভাষার্থ করা আছে,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ যে করয়॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্তে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপচয়॥
রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে সুকৃতি বা ভগবৎকৃপা না থাকিলে সাধুসঙ্গ হওয়াও কঠিন। ভক্তি স্বাধীনা নন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যে ভগবানকে ভক্তি করিতে বা শ্রদ্ধা করিতে পারিবে তাহা নয়। কোন এক নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে ভগবানকে ভাল বাসিতে ও সাধু সঙ্গ করিতে আরম্ভ করিব এই প্রকার স্থির করিয়া ভগবানকে ভাল বাসা যায় না। ভগবানের প্রসাদেই জীব ভগবানকে ভক্তি করিতে, ও ভালবাসিতে পারেন। বৈষ্ণব মহাত্মগণ সেই হেতু ভক্তিকে স্বাধীনা না বলিয়া "প্রভুর মহাপ্রসাদরূপা" বলেন। সাধনমার্গে সৎসঙ্গের অত্যন্ত

প্রয়োজন। বিষয়ী ও বিষয় সংসর্গ যেমন হেয়, সৎসঙ্গ তদ্রূপ বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। ভাগবতে কথিত আছে,—

"মহৎসেবাং দ্বার মাহুর্ব্বিমুক্তেঃ"। ৫।৫।২

মুমুক্ষুদিগের আশু কর্ত্তব্য কি এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মণিরত্নমালা গ্রন্থে বলিলেন, "সৎসঙ্গতির্নির্ম্মমতেশভক্তিঃ।" ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে হইলে, এমন কি ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে হইলে অবিরত সাধুসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি ভক্তি ভিক্ষা করাও যেমন প্রয়োজনীয়, ভক্তসঙ্গভিক্ষা প্রায় তেমনি। প্রেমিক সাধক গোপীকান্ত তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন।

"এই কৃপা কর প্রভু, তুয়া ভক্ত সঙ্গ কভু,
না ছাড়িয়ে জীবনে মরণে॥"

মার্কণ্ডেয় ভগবানের নিকট হইতে বর চাহিলেন—

ভগবত্যুত্তমাং ভক্তিং ত্বৎপরেষু তথা ত্বয়ি"। ১২।১০।৩৪

ভাগবতে উক্ত আছে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃকথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩।২৫।২৪

পাপ তাপ ক্লিষ্ট মানবের পক্ষে সৎসঙ্গ পরমৌষধী, "সতাং সঙ্গোহি ভেষজম্"। তবে সৎসঙ্গ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥

ঋষিগণ বলিলেন, মর্ত্ত্য গণের আশীর্ব্বাদের কথা ছাড়িয়া দাও; অত্যল্প কাল মাত্র ভগবৎসঙ্গিসঙ্গ লাভ করার সহিত স্বর্গ এমন কি অপবর্গের পর্য্যন্ত তুলনা হয় না।

তুলয়ামো লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১।১৮।১৩

ধর্ম্মজীবনে সৎসঙ্গের অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সঙ্গ দুই প্রকারে হইতে পারে। কোন পরলোকগত মহাত্মার জীবনীপাঠ ও কার্য্য কলাপ দ্বারা মনের গতি পর্য্যালোচনা করা, অথবা কোন জীবিত মহাত্মার সেবা শুশ্রূষা করা ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করা, এই দুই প্রকারে সাধুসঙ্গ হইতে পারে। দুই প্রকারের সাধুসঙ্গই মানবজীবনে প্রয়োজনীয়। কেবল জীবনী পাঠ করিলে বা উপদেশ আদি শ্রবণ করিলেই যে সম্পূর্ণ ভাবে সাধু সঙ্গ করা হয় তাহা নহে। পরলোকগত মহাত্মার সঙ্গ করিতে হইলে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিবার কালে হৃদয়ের যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন ও উৎকর্ষ হেতু তিনি লোকবিশ্রুত হইয়াছেন সেই বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ক্রমে অনুশীলন দ্বারা যখন হৃদয়ের অবস্থা এতাদৃশ উন্নত হইবে যে সেই মহাত্মার নাম বা কথা মনের মধ্যে উদয় হইলেই তাঁহার বিশেষ গুণও হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক হইয়া হৃদয়কে সেই মহাভাবে পূর্ণ করিবে তখনই যথার্থ সাধু সঙ্গ হয়। এই প্রকারে সাধুসঙ্গ হইতে ভক্তির সঞ্চার হয়। মহাত্মা বুদ্ধদেব বৈরাগ্য ও মৈত্রীর আদর্শ স্বরূপ। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে, তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও অশ্রুতপূর্ব্ব প্রেম অনুভব করিয়া হৃদয়ে যখন বৈরাগ্য ও প্রেম জ্বলন্ত হইয়া উঠিবে তখনই সাধকের বুদ্ধদেবসঙ্গ করা প্রকৃত হইবে। অনুশীলনই ভক্তিসাধনের

অঙ্গ, ও সাধুসঙ্গ অনুশীলনের প্রধান সহায়। সেই হেতু সকল শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গকে ধর্ম্মজীবনের প্রধান আশ্রয় ও অবলম্বনস্বরূপ বলা হইয়াছে। যাঁহাকে দেখিলে ভগবানের প্রেমের কথা মনে আসে তিনিই সাধু, যাঁহার সংসর্গে মন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় তিনিই সাধু। বিদ্যা উপার্জ্জন বা শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি প্রাকৃত বিষয় ব্যাপারে যেমন আচার্য্য বা উপাধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন, ভক্তি পথেও সেইরূপ উপদেষ্টার প্রয়োজন। অধ্যাপকের সহিত ছাত্রদের যে প্রকার নিত্য সম্বন্ধ, উপদেষ্টার সহিত সাধকেরও সম্বন্ধ নিত্য। প্রাকৃতজগত অপেক্ষা ধর্ম্মজগতে আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ আরও গভীর ও আন্তরিক। অধ্যাপক ছাত্রের হৃদয়ের অবস্থা জানেন না, তাহার হৃদয়ের গতি জানেন না, হৃদয়ের বেদনা বুঝেন না, সেই হেতু তাঁহাদের পরস্পরের আকর্ষণ অপেক্ষা উপদেষ্টা ও সাধকের আকর্ষণ বেশী গভীর। ধর্ম্মজীবনে প্রতি পদে কত বিঘ্ন রহিয়াছে, কাম ক্রোধ আদি সাধারণ শত্রুগণ ত আছেই, তাহার উপর ধর্ম্মজীবনের বিশেষ শত্রুগণ—নৈরাশ্য, গর্ব্ব, শুষ্কতা, প্রার্থনাহীন অবস্থা—রহিয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মজীবনে এমন কোন লৌকিক উপদেষ্টা বা আত্মীয় থাকা চাই যিনি সাধকের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাহাকে সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যত্নবান্। এমন একটি সাধু মহাত্মা চাই যিনি বিশেষ ভাবে সাধকের ধর্ম্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও সাধকের ভক্তিসাধনের সহকারী হন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের ভিতর কোন মধ্যবর্ত্তী নাই বটে, কিন্তু জ্ঞানপ্রদ উপদেষ্টার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সাধক ভগবানে নির্ভরশীল হইবে, ছেলে মা'র উপর নির্ভর করিতে শিখিবে, ছেলে প্রাণ ভরে মাকে ডাকবে, ইহার মধ্যে কোন উকীল বা মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন থাকিতে

পারে না। ভগবানকে ভালবাসিতে শিখিবার রহস্য কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে থাকিতে পারে না। ডাকার মতন ডাকা হইলেই যথেষ্ট, না পারিলে তাঁহারই কাছে কাঁদিয়া পড়াই কর্ত্তব্য; তিনি ডাকিতে শিখাইয়া দিবেন। যাহাতে তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ রূপে পাওয়া যায় সে বুদ্ধিযোগ তিনিই দিবেন।

উপনিষদে কথিত আছে "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে, প্রথমে স্বীয় আত্মার ভিতরে, পরে বাহ্যজগতে ভগবানকে দেখিতে হইবে। ভগবৎসম্বন্ধে শুনিতে হইবে, আত্মীয়জনের সহিত ভগৎসম্বন্ধে আলাপাদি করিতে হইবে। পরে সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ প্রভৃতি বিচার করিয়া মনন করিতে হইবে। ভগবানের সম্বন্ধে নিয়ত আলোচনা ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। ধীর ব্যক্তি শান্ত ভাবে সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিলে একটি অনন্ত শক্তিময় সত্তা দেখিতে পান। নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তর অন্বেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সেই অনন্ত শক্তিময় সত্তা অনন্ত জ্ঞানময় অনন্ত প্রেমময় মহাপুরুষ। যদিও পুরুষ বলিলে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি তিনি ঠিক তাহা নন কিন্তু মানবের ভাবা তাঁহার কাছে আর বেশী যাইতে পারে না। সেই নিত্য সত্য সত্তা স্বরূপ হইতেই তাহার প্রেমময় আনন্দময় ও জ্ঞানময় স্বরূপ প্রতীয়মান ও উপলব্ধ হয়। আলোচনা করিতে করিতে ভগবৎ-স্বরূপ প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। পরে এই জ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের নিত্যত্ব অনন্তত্ব প্রেমময়ত্বাদি স্বরূপজ্ঞান নিত্য হৃদয় মধ্যে পোষণ করিতে করিতে এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের ঘটনাবলীর সহিত চিন্তা করিতে করিতে আমরা ক্রমশঃ ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। ক্রমশঃ যাহা কদাচিৎ কখন বিজলির ন্যায়

প্রাণের মধ্যে উপলব্ধ হইত, তাহা নিদিধ্যাসন প্রভাবে করতলগত আমলকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই কথাগুলি দ্বারা আমি এমন কিছু বলিতেছি না যে জ্ঞান হইতে আত্মপ্রত্যয়সার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মনিত্য প্রকাশমান হইলেও সাধনার প্রথম অবস্থায় সকল সময় সুখোপলভ্য নহেন। একবার চিদাকাশে উদিত হইলে জ্ঞান ও স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির সাহায্যে পুনঃ পুনঃ হৃদয় মধ্যে তাঁহার স্বরূপ ধারণা করিতে হয়, কালক্রমে অভ্যাস দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ সাধকের হৃদয়ে নিত্য প্রকাশমান হইতে থাকে। ইহাই গীতায় কথিত অভ্যাস যোগ। অভ্যাস যোগের দ্বারা ভগবানের অস্তিত্বে ও তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও শক্তিতে অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিলে সাধক ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারেন। সাধক যখন ভগবানের উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে সক্ষম হন, তখন তাহার সকল প্রকার দুঃখের শেষ হয়, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

বালক যেমন বেশ জানে ও উপলব্ধি করে যে তাহার মাতা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহার মা অনেক জানেন, এমন কি যাহা কেহ জানেনা অতি দুরূহ তাহাও তাহার মা জানেন, সাধক সেই প্রকার বালকের মত ভগবানের স্বরূপ, তাঁহার অস্তিত্ব, প্রেম, ও জ্ঞান নিরন্তর উপলব্ধি করেন। মাতার অস্তিত্বে, মাতার জ্ঞান শক্তি ও স্নেহে বালকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই বালক তাঁহার মাতার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিতে পারে। মাতা যতই নিরক্ষর হউন না কেন, বালক তাহার পাঠ অভ্যাস করিতে না পারিলেই তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করে,— মা! এইটী আমাকে বুঝাইয়া দাও। সে আর মনে আনেনা যে উহা তাহার মাতার শক্তিরও বহির্ভূত। যদি তাহার মাতা বলেন যে তিনি জানেন না, তখন বালক স্বতঃই

বলিবে "তুমি মা, তুমি আর জাননা" ? যেন মা হোলে সকলই জানিতে হয়। শিশুর এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাহার মাতার উপর এই ঐকান্তিক নির্ভরের কারণ। এই বিশ্বাস বশতই দুই বৎসরের শিশু শূন্য হইতে নির্ভয়ে তাহার মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ভগবানের সত্তা, প্রেম, জ্ঞানও শক্তির উপর উক্ত শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাস থাকিলে সাধক স্বতঃই ভগবানে ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করিতে পারেন। শিশুর উক্ত প্রকার বিশ্বাসের কোন পার্থিব কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতার উপর তাহার নির্ভর অহৈতুক; এই বিশ্বাস প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক। যদি কোন প্রেমিকের ভগবানের প্রতি ঐ প্রকার প্রকৃতিগত স্বাভাবিক স্থির ও অটল বিশ্বাস থাকে তিনি মহাত্মা, তিনি নমস্য। কিন্তু শিশুর ঐ বিশ্বাস স্থির বা অটল নয়; কালক্রমে বালক যখন স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত দেখিতে পায় যে তাহার মাতার শক্তি অল্প, জ্ঞানও অল্প, তখন বালক আর তাহার মাতার উপর ততটা নির্ভর করিতে পারে না। তখন বালকের মনে হয় যে তাহার মাতার পড়াশুনা বেশী নাই, মা সব জানেন না, শৈশবের অন্ধ বিশ্বাস কিশোরে আর স্থির ও অচল থাকে না। ভগবানের স্বরূপে বিশ্বাসও বিচারবুদ্ধিরূপ স্থির অচল প্রস্তরভিত্তির উপর স্থাপিত করা উচিত; নচেৎ ভক্তিসাধন দৃঢ় হইবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্সদেশের লোকের ধারণা ছিল যে ভগবান তাঁহার সৃষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, জগতের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান নন। কিন্তু ফ্রান্সদেশের জ্ঞানিগণ যখন জানিতে পারিলেন যে তাহা ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ নয়, তখন তাহারা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। ভগবানের স্বরূপে অন্ধ বিশ্বাস স্থির ও অচল নয়। শিশুর প্রকৃতির সহিত এ বিষয়ে মানবাত্মার সম্পূর্ণরূপ

সাদৃশ্য। মাতার সহিত শিশুর যে সম্পর্ক ভগবানের সহিত মানবাত্মারও সেই সম্পর্ক। শিশু যেমন যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না কেন তাহার মার কাছেই আসিয়া তাহার মাতাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য কাতর নয়নে অনুরোধ করে, সাধকও সেইরূপ করেন। বিপদের সময় বলেন, "তুমি বিনা আর, কে আছে আমার, কে দুঃখ নিবারে"। বালকের ক্ষুধা পাইলে, কিংবা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সে তাহার মার কাছে ত যাবেই, পড়াশুনা অভ্যস্ত হইতেছেনা অতএব চল মার কাছে, গাছ হইতে লেবু পাড়িতে পারিতেছে না চল মার কাছে; খেলিবার মার্‌বেল হারাইয়াছে চল মার কাছে; মা নিশ্চয়ই জানেন তাহা কোথায় আছে। সন্তান জানে যে তাহার সামান্য খেলিবার দ্রব্যেও তাহার মাতার দৃষ্টি আছে। বালক যখনই চলিতে বসিতে উঠিতে খেলিতে নিজের বুদ্ধির ও শক্তির অল্পতা অনুভব করে, তখনি সে তাহার মাতার আশ্রয় লয়। বিশেষ করিয়া যে কোন একটি শিশুর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ঐ নির্ভরশীলতার কারণ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই; এই বিষয়গুলি দেখিবার জন্য সাধন সম্বন্ধে কোন গোপনীয় সন্ধানের বা অন্তর্লক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। ধীর ব্যক্তি শান্ত ভাবে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। নিজের শৈশবাবস্থা ভাবিলে তাহার কারণ উপলব্ধি হইবে।

প্রথমে বালক নিজের শক্তি ও বুদ্ধির যথাসাধ্য চালনা করিয়া বুঝিতে পারে যে তাহার শক্তি ও বুদ্ধি অল্প। দ্বিতীয়তঃ, তাহার মাতার স্নেহ শক্তি ও জ্ঞানের উপর বালকের ঐকান্তিক বিশ্বাস। এই দুইটিই বালকের নির্ভরশীলতার ভিত্তি। ভগবচ্চিত্ত ও ভগবৎপ্রাণ হওয়াই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে তাঁহাকে অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত শক্তিময়, অনন্ত জ্ঞানময় বলিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্তা নিরন্তর প্রাণের

অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা ধ্যান ও ধারণাশক্তি উৎপন্ন হইবে। যখন কোন সাধক স্থিরভাবে উপলব্ধি করেন যে তাঁহার প্রতি ভগবানের সম্পূর্ণ স্নেহ রহিয়াছে ও সেই ভগবানের শক্তি জ্ঞান ও প্রেম অনন্ত, তিনি সদা সর্ব্বদা প্রাণের ভিতরে আমাদের প্রত্যেক প্রাণস্পন্দনের কারণ স্বরূপ হইয়া অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, তখন কোন বাধা বিপত্তি তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। সেই সাধক সুখ দুঃখ, শক্র মিত্র সকলে সমভাব হন। তিনি জানেন যে যখন যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তিনি তখনই তাহা পাইবেন, সুতরাং তিনি সদা সন্তুষ্ট, নিস্পৃহ, সঞ্চয়হীন, ও কাম্যকার্য্যে ত্যক্তোত্তম। তিনি সদাই আনন্দময়। তিনি হিংসাশূন্য মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযত স্বভাব, অপ্রমত্ত, ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমবশতঃ তিনি ভগবদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য, ভগবানে সমর্পিতমনাঃ। তাঁহা হইতে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় না। তিনি পরশ্রীকাতরতা, ভয়, ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত। তিনি বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, পক্ষপাতশূন্য, মনোবেদনাহীন, দক্ষ অর্থাৎ কার্য্যপটু, তিনি কাম্য কর্ম্ম সম্পাদনে ঈহাশূন্য। তিনি শাস্ত্রীয় ব্যতীত সকল প্রকার কর্ম্মারম্ভ পরিত্যাগী। তিনি শত্রু মিত্রে, লাভ অলাভে, মান অপমানে, শীত গ্রীষ্মে, সমভাবাপন্ন। তিনি বিষয় ও বিষয়িসঙ্গপরিত্যাগী, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাব, অল্পে সন্তুষ্ট, স্থিরমতি। মানবজীবনে যাহা কিছু প্রার্থনীয় গুণ হইতে পারে সে সকলই ভগবন্নিষ্ঠ অহৈতুক ভক্তি-যোগের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ সহচর।

উপনিষদে উক্ত আছে তাঁহার প্রেমের কণা মাত্র লাভ করিয়া মানবে জীবন যাপন করে। সংসারে আমরা যে আনন্দ উপভোগ করি, যে শান্তি পাই, তাহা তাঁহারই মঙ্গলময় ভাবের কণামাত্র।

পুত্রবাৎসল্য, মাতৃভক্তি, পিতৃস্নেহ, পতিপরায়ণতা ইত্যাদি মানবের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকল তাঁহারই মঙ্গলময় মহাপ্রেমের কণা মাত্র। উপনিষদে আরও কথিত আছে যে আনন্দস্বরূপ ভগবান হইতেই এই ভূতসকল জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। এই সত্য সকল সত্বেও যিনি মনে করেন যে সংসার সয়তানের, সংসারে আনন্দ ও শান্তির লেশ মাত্র নাই, তিনি ভ্রান্ত। যখন আমাদের হৃদয় পুত্রস্নেহ, সহানুভূতি, মৈত্রী প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের স্বর্গীয় বৃত্তির দিকে পরিচালিত করি তখন আমাদের হৃদয়ে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়, কিন্তু এই প্রেমজাত শান্তি ও আনন্দ তাঁহার প্রতি প্রেমজাত আনন্দের আংশিক প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সাংসারিক প্রেমজাত আনন্দ ও শান্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, যেহেতু উহারা নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও দুঃখ দ্বারা জড়িত ও দেশকাল দ্বারা আবদ্ধ। অহোরাত্রের মধ্যে অতি অল্প সময়ই আমরা আনন্দ উপভোগ করিতে পাই, ও সেই অল্প সময়ের অতি অল্পাংশ সময় সেই আনন্দ বিমলভাবে ও পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করি। সাংসারিক আনন্দ অত্যন্ত অল্পকালস্থায়ী ও নশ্বর, তথাপি একেবারে হেয় নয়; ভগবৎপ্রেমজাত আনন্দ অপেক্ষা অসংখ্য গুণে হীন বটে কিন্তু একান্ততঃ উপেক্ষণীয় নহে। তবে যদি সাংসারিক আনন্দের সহিত ভগবৎপ্রেমজাত আনন্দের সংঘর্ষ হয় তাহা হইলে সাংসারিক আনন্দ যতই আপাততঃ মনোরম হউক না কেন পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে ভগবৎপ্রেমের সহিত সাংসারিক প্রেমের যে সংঘর্ষ হইবেই এমন কোন নিয়ম নাই; তবে যদি সংসারেই আসক্তি থাকে তাহা হইলে সংঘর্ষণ হইবে। বস্তুতঃ সংসারও যখন ভগবানের, ভগবানের সত্তা যখন সকল পদার্থও সকল ঘটনাকে ওতপ্রোত করিয়া রাখিয়াছে; ভগবান যখন সংসারের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে বিধাতৃও নিয়ন্তৃ ভাবে বর্ত্তমান

আছেন তখন যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে বিচার পূর্ব্বক সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে সংঘর্ষণের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। সাংসারিক আনন্দ অতি অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু নিত্য সত্য ভগবানের প্রতি প্রেম কোন প্রকার দুঃখ বা বিক্ষেপ বা দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ নয়, উহা নিত্য ও অসীম। ভগবদ্‌ভক্ত সর্ব্বক্ষণ তাহার প্রেমাস্পদকে তাঁহার কাছে লইয়া তাঁহাকে অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া বিমল পূর্ণানন্দ ভোগ করেন। সংসারে থাকিয়া আমরাও আনন্দ ও শান্তি ভোগ করিতে পাই, ভক্তও ভগবানকে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর জানিয়া ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া শান্তি ও আনন্দ ভোগ করেন। সাধকের আনন্দ ও আমাদের আনন্দের মধ্যে অসীম পার্থক্য। আমাদের আনন্দ দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ, ক্ষণমাত্রস্থায়ী ও অপরাপর অনেক পদার্থের উপর নির্ভর করে; অপর পক্ষে সাধক আত্মরতি, সাধক তাঁহার আনন্দের জন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর করেন না। তাঁহার আনন্দ পূর্ণ ও বিমল, নিরবচ্ছিন্ন ও অনাবদ্ধ।

এক্ষণে আমাদের এত কঠিন ভাবে আবদ্ধ, দেশ কাল দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধ, বিক্ষেপাত্মক আনন্দকে কি উপায়ে অনাবদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দে পরিণত করিতে পারা যায়? এই স্থলে দেখা যাউক যে আমাদের আনন্দ এত আবদ্ধ কেন? আমাদের প্রেমাস্পদ বস্তু অর্থাৎ আমাদের পুত্র কন্যা পিতা মাতা সুহৃৎ স্বামী দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ, সুতরাং তাহাদের প্রতি প্রেমহেতু আনন্দ ও আবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী। এখন যদি আমরা কোন প্রকারে দেশ কাল দ্বারা অনাবদ্ধ, বিক্ষেপবিকার হীন, নিত্য সত্য বস্তুকে আমাদের প্রেমাস্পদ বলিয়া পুত্র কন্যা বা পিতা-মাতা বা সুহৃৎ স্বামী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে আমা-দেরও আনন্দ দেশ কাল দ্বারা অনাবদ্ধ বিকারশূন্য নিরবচ্ছিন্ন ও বিমল হইবে। এইপ্রকার উপলব্ধিই ভক্তিপথের গূঢ়তত্ত্ব।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন তবে কি ভগবানের কোন মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইবে? বাস্তবিক কল্পনা কিছুই করিতে হইবে না, অনুভব করিতে হইবে ও উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহা নিত্য সত্য তাহার আবার কল্পনা কি হইবে? তবে মূর্ত্তি কথাটিতেই কি আপত্তি? এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে এই বিশ্বজগতের মধ্যে কোনটী তাঁহার মূর্ত্তি নয়? কোনটী তাঁহাকে ছাড়িয়া বিদ্যমান আছে? কেহ কি বলিতে চান যে ভগবান চরাচর বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান নন? যাহা দর্শন শ্রবণ ও মনন করিলে হৃদয়ে অসীম আনন্দ হয় ও সাত্ত্বিক ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হয় তাহাই ভগবদ্দর্শন শ্রবন ও মনন। গীতাতে কথিত আছে।

পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ।
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ .... ॥ ৯।১৭,১৮

সুবলোপনিষদেও উক্ত আছে—

"দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌গতির্নারায়ণঃ।"

অপর এক স্থলে কথিত আছে—

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে নহস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকংভবতি॥"

পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে, যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন তাহার প্রিয় কখনও মরণশীল হয় না। অবিনশ্বর নিত্য সত্য ভগবানকে প্রিয় বলিয়া উপলব্ধি করিলে সাধকের কখনও প্রিয় বিচ্ছেদ হয় না। কোন কোন সাধক ভগবানকে গোপাল ভাবেই হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, কেহ বা তাহাকে প্রাণের উমা মনে করিয়া গিরিরাণীর ন্যায় ভগবদুপলব্ধি করেন। যাহার মনের যে প্রকার

গঠন, যাহার যে প্রকার সুকৃতি, সে সেই ভাবেই ভগবানকে উপলব্ধি করে। মাতা পিতা সুহৃৎ স্বামী সবাই নশ্বরদেহবিশিষ্ট এবং দেহি ধর্ম্ম-যোগে রাগদ্বেষাদির বশীভূত ও অপূর্ণ। সুতরাং তাঁহাদের কাহাকেও পূর্ণ সত্ত ভগবানের সহিত একীকরণপূর্ব্বক উপাসনা করা প্রশস্ত না হইতে পারে; কিন্তু ভক্তিপথের উদ্দেশ্য যে, মাতৃভাব বা পিতৃভাব বা স্বামিভাবকে ভগবদ্‌ভাবের সহিত এক করিতে হইবে অর্থাৎ ভগবান্‌কে ঐ ভাবে ভাল বাসিতে হইবে। যিনি যে ভাবে উপলব্ধি করুণ না কেন, কার্য্য এক, ফল এক, ভক্তি এক, সাধনা এক, সাধ্য এক।

যিনি যে ভাবে ভগবানকে ভজনা করুন না কেন, তিনি সেই ভাবেই ভগবানকে পান।

"কারুর মাতা, কারুর পিতা, কারুর সখা সুহৃদ্ হও।
ভাবে ভুলে যে যা বলে তাতেই তুাম প্রীত রও॥

বৈষ্ণবগণ বলেন যে বিশেষ ভাবে বিচার করিলে কিছু তারতম্য আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কথিত আছে—

কৃষ্ণ প্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তের তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তর তম॥

বৈষ্ণব মতে অধিকারিভেদে রতি বা প্রেম পাঁচ প্রকারের!

ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্ত রতি দাস্য রতি সখ্য রতি আর॥
বাৎসল্য মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ।
রতি ভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চ ভেদ॥

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

দৃষ্টান্ত স্থলে কথিত আছে যে সনকাদির ভাব শান্তভাব। "দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার"। যশোদার বাৎসল্যভাব। শ্রীদামাদি ও ভীমার্জ্জুনের ভাব সখ্যভাব, এবং ব্রজগোপীগণ মহিষীগণ ইহাদের মধুর ভাব। প্রেম যত গাঢ় হইতে থাকে ভক্ত ভগবানকে ততই আপনার কাছে বলিয়া অনুভব করেন। ভগবানকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ বলিয়া উপলব্ধি করেন, তখন ভগবান তাহার কাছে আর অনন্ত মহান থাকেন না, প্রেম তখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিহীন হইয়া পড়ে।

পুন কৃষ্ণ রতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা কেবল ভেদ আর॥

এক প্রকার উপাসনাতে উপাস্যের মহত্ব, অনন্তত্ব, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত আছে, আর এক প্রকারে কেবল উপাস্য উপাসকে প্রেমিক প্রেমাস্পদের ভেদটুকু মাত্র আছে। বৈষ্ণবমতে

গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ প্রেম অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের। সেই হেতু রাধার প্রেম লক্ষ্মী দেবীর প্রেম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। লক্ষ্মীদেবী রাধার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে কথিত আছে। শান্ত ও দাস্য ভাবে ঐশ্বর্য্য ভাব আছে, কিন্তু বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর ভাবে ঐশ্বর্য্যভাবকে সঙ্কোচিত করিয়া আনে।

যে হেতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কোচিতা প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥

শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
বাৎসল্য সখ্য মধুরেতে করে সঙ্কোচন॥

বৈষ্ণবমতে শান্ত অপেক্ষা দাস্য, দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর বা কান্তা প্রেম উচ্চ। কান্তা প্রেমের মধ্যে আবার গোপী প্রেম শ্রেয়ঃ এবং রাধা প্রেম সর্ব্বোত্তম।

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥

শান্ত রসে কেবল স্বরূপজ্ঞান, দাস্যে পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক। দাস্য প্রেমে শান্তরসের স্বরূপজ্ঞান আছে, অধিকন্তু সেবা গুণ আছে। সখ্যে শান্তের গুণ ও দাস্যের সেবন এ দুই আছে, অধিকন্তু

"বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরবসম্ভ্রমহীন"।

সখ্যে কৃষ্ণে মমতা অধিক ও তাঁহাকে আত্মসম জ্ঞান হয়। বাৎসল্যে শান্তের স্বরূপজ্ঞান দাস্যের সেবন এ দুই আছে। সেই সেবন বাৎসল্যে পালনের আকার ধারণ করে। সখ্যের গুণ অসংকোচ ব্যবহারও বাৎসল্যে বর্ত্তমান আছে, এবং তাহা মমতাধিক্য বশতঃ তাড়না ও ভর্ৎসনার আকার ধারণ করে।

আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে কৃষ্ণে নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসংকোচ মমতাধিক হয়॥
কান্তা ভাবে দেহ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রস হয় পঞ্চ গুণ॥

শান্ত ভক্তের রতি প্রেম পর্য্যন্ত বাড়ে, দাস্য ভক্তের রতি রাগ দশার অন্ত পর্য্যন্ত, সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত, পিতৃ মাতৃ স্নেহ আদি

অনুরাগ পর্য্যন্ত, কান্তাগণের রতি মহাভাব সীমা। প্রেম বর্দ্ধিত হইয়া স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব ও মহাভাব হয়।

গভীর প্রেমের লক্ষণ এই যে, প্রেমাস্পদকে আপনার সমান করিয়া আনিতে চায়। কখন কখন প্রেমাস্পদকে যেন স্নেহাস্পদ করিয়া ফেলে। সেই হেতুই বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রে সখ্য ও বাৎসল্য রস শান্ত ও দাস্য ভাব অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের বলিয়া উক্ত আছে।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহারই অধীন॥

শান্ত ও দাস্য ভাবে ভগবদুপাসনাতে ভগবান্ মহান্ বিশ্বেশ্বর, কিন্তু যখন প্রেম গাঢ় হইয়া পড়ে যখন ভক্ত ভগবানকে তাহার মাতা পিতা সখা বা স্বামী ভাবে ভাল বাসেন তখন তিনি ভগবানকে নিজের সমান জ্ঞান করেন।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি চতুর্থ।

একদিন দুইটী ভক্ত কোন কার্য্যবশত একটী নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। অরণ্যানী মধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়াতে সেই দুইটী পথিক নিকটে হিংস্র বন্যজন্তুগণের শব্দ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত

হইয়া পড়িলেন। তখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন ভাই! ভয় নাই। এস আমরা এই স্থানে বসিয়াই ভগবানকে ডাকি, ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই ভক্ত পথিকটি শান্ত ভাবের উপাসক। কিন্তু অপর পথিকটি কহিল "না ভাই, কেন মিছা ভগবানকে কষ্ট দিব? চল আমরা গাছের উপর গিয়া রাত্র অতি-বাহিত করি।" এই পথিকটি প্রেমিক ভক্ত। ইনি তাঁহার প্রেমাস্পদকে একটু মাত্র কষ্ট দিতে চাননা, ইনি ভগবানকে নিজের মতন বোধ করিয়া মনে করিলেন যে, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে ভগবানের একটু কষ্ট হইবে, তিনি ভগবানকে সে কষ্ট দিতেও অনিচ্ছুক। সেই প্রেমিক পথিকের ভাব সখ্য ভাব।

মধুর ভাবের উপাসনাতে বিন্দুমাত্র কামগন্ধ নাই। কামগন্ধ থাকিতে মধুর ভাবের উপাসনা কদাপি হইতে পারে না।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥

রাসলীলা ও ব্রজগোপী ব্যাপার যথার্থ ঐতিহাসিক কিনা সে বিষয়ে বিচার করা আমার অভিপ্রায় নয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কান্তাপ্রেমের যৎসামান্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্রজগোপীদের প্রেম বৈষ্ণবগণ কি প্রকার আলোকে ব্যাখ্যা করেন তাহাই আমি এই স্থলে দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিলাম।

বৈষ্ণবশাস্ত্র মতে মধুর প্রেমই শ্রেষ্ঠ। এই মধুর প্রেমের মধ্যে

রাধার প্রেমই সর্ব্ব শীর্ষস্থানীয়। নারদপঞ্চরাত্রে রাধাকে সর্ব্বশক্তি-রূপিণী বলা হইয়াছে। মহাত্মা চৈতন্যদেব নিজের জীবনে ভগবানকে রাধাভাবে উপাসনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই হেতু বৈষ্ণবগণ বলেন যে রাধাভাবের উপাসনা করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যাবতার গ্রহণ করেন।

শ্রীরূপগোস্বামীর কড়চাতে উক্ত আছে ঃ—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি র্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যাং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

পুনঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদি খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে কথিত আছে—

সেই রাধা ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগ ধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥

মহাত্মা চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অবস্থান কালে মধুর ভাবের পরাকাষ্ঠা রাধাপ্রেম সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেন।

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ প্রলাপ ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান ॥

শ্রীচৈতন্যদেব কাতর হইয়া বলিলেন ;—
"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

কাতর হইয়া যেমন আত্মহারা হইতেন উপলব্ধির সময়ও তন্ময় হইয়া বলিতেন ;—

কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরো, সেবা করি সুখী করো,
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥

বৈষ্ণবধর্ম্মমতানুসারে ভগবানকে স্বামিভাবে উপাসনা করা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা কঠিন। এই স্বামিজ্ঞান করিয়া ভগবানকে উপাসনা করা স্বকীয়ভাবের সাধনা। পরকীয়ভাবে অর্থাৎ গোপীভাবে উপাসনা আরও কঠিন। রাধাকৃষ্ণের ভক্তভগবানের মিলন সংঘটন করানই গোপীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, ইহাতেই তাহাদের আসক্তি, ইহাতেই তাহাদের ভূমানন্দ। এত স্বার্থত্যাগ, এত ভালবাসা, কেবল ব্রজ গোপীদের মধ্যেই পাওয়া যায়। স্বর্গরাজ্যে সহস্রগুণ পাইবার আশায় ধর্ম্মসাধন করা অপেক্ষা ইহা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ। গোপীভাবে সাধন অতি উচ্চাঙ্গের ও অতি কঠিন। বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের মতে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক তদীয় পার্ষদ ও প্রধান প্রধান ভক্তদিগের মধ্যে অতি অল্প মহাত্মাই গোপীভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, রূপ, সনাতন, জীব, গদাধর প্রভৃতি কেহই গোপীভাবে সাধনা করিতে সমর্থ হন নাই। স্বরূপ গোস্বামী, রামানন্দ রায়, শিখি মাইতি ও মাধবী এই কয়জন মাত্র পারিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব মহাত্মগণ প্রেমকে দুই প্রকার ভাবের বলিয়া গিয়াছেন। একটী স্বকীয় ভাবের, অপরটী পরকীয় ভাবের। আপনার বস্তু বা ব্যক্তিতে যে ভালবাসা জন্মায় তাহা স্বকীয় ভাবের ও অপরের বস্তুতে যে ভালবাসা জন্মায় তাহা পরকীয় ভাবের। স্ত্রী স্বামীকে যে ভালবাসেন তাহা স্বকীয়ভাবের মধুর প্রেম, এবং যাহার সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ নয় এমন স্ত্রী পুরুষে যে মধুর প্রেম তাহা পরকীয়ভাবের মধুর প্রেম। বোধ হয় মাধবেন্দ্রপুরীই প্রথমে পরকীয় ভাবের প্রেমকে প্রাধান্য প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবমতানুবর্ত্তিদের মতে স্বকীয় প্রেম যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, তাহা অল্প বিস্তর স্বার্থ গন্ধে দূষিত। পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর স্বামীর প্রতি যে ঐকান্তিক প্রেম তাহাতেও কণামাত্র স্বার্থগন্ধ আছে। যেহেতু তাঁহারও ধারণা যে স্বামীই রমণীর একমাত্র গতি, স্বামীকে একমাত্র গতি বোধে ভালবাসিতে হয়, নচেৎ ধর্ম্মে পতিতা হইতে হইবে। সুতরাং সেই স্বামিভক্তিও কারণমিশ্রা, সুতরাং সকাম। পুনশ্চ স্বকীয় প্রেমে স্ত্রী স্বামীকে স্বামী বলিয়াই ভালবাসেন। যদি তাহার সহিত বিবাহ না হইয়া অপর লোকের সহিত হইত তাহা হইলে তাহাকেই ত সেই ভাবের ভালবাসিতেন, সুতরাং স্বামিত্বই ভালবাসার কারণ। সেইরূপ সকল ভাবের স্বকীয়প্রেমে স্বকীয়ত্বই ভালবাসার কারণ। কারণবিশিষ্ট অপেক্ষা কারণহীন ভালবাসা উচ্চাঙ্গের, এবং পরকীয়া প্রেম কারণহীন। উচ্চাঙ্গের প্রেমের লক্ষণ এই যে কেন ভালবাসি তাহা জানি না। পরকীয় ভাবের প্রেম স্বকীয় ভাবের প্রেম অপেক্ষা নিষ্কাম, সেই হেতু উচ্চাঙ্গের সাধন। ভগবানের প্রতি স্বকীয় ভাবের প্রেম অপেক্ষা পরকীয় ভাবের প্রেম উচ্চাঙ্গের সাধন। ভগবানের প্রতি স্বকীয় ভাবের প্রেমে হৃদয়ের উন্মত্ততা নাই। পত্নী ভাবে ভগবানকে

উপাসনা অপেক্ষা গোপীভাবে উপাসনাই শ্রেয়ঃ। স্বকীয় ভাবের অপেক্ষা পরকীয় ভাবের প্রেম অধিক মিষ্ট ও উন্মাদকারী। "ভগবান যাহার উপপতি তিনি সম্পূর্ণ সুখিনী যেহেতু ভগবান আস্বাদের সামগ্রী, এবং যে পদার্থ যত দুর্ল্লভ তাহার আস্বাদন ততই মধুর। স্বামিসংসর্গ স্ত্রীলোকের দুল্লভ ও উন্মাদকারী নয়, পরন্তু অপরপুরুষসংসর্গ দুর্ল্লভ বলিয়া অধিক মিষ্ট ও উন্মাদকারী। প্রিয় বস্তু যদি দুর্ল্লভ হন তবে তিনি পরমপ্রিয় হন। প্রিয়জন যখন দুল্লভ হন, কিংবা প্রিয়জনকে প্রাপ্তির নিশ্চিততা যায়,তখনই পরকীয় রসের উদয় হয়। ভজন দ্বারা উপপতিকে পাইবার অনেক বাধা ও অনিশ্চিততা। ভগবানকে ভজনা করা সম্বন্ধেও অনেক বাধা ও অনিশ্চিততা, অতএব ভগবানকে পতি ভাবে উপাসনা করা অপেক্ষা উপপতি ভাবে উপাসনা করাই স্বাভাবিক"। বস্তুতঃ প্রিয় বস্তু যত দুর্ল্লভ হন প্রেম ততই মধুর ও চিত্তোন্মাদকারী হইতে থাকে। আপনার বস্তুও যদি দুর্ল্লভ হয় তাহা হইলে স্বকীয় প্রেমও পরকীয় মাধুর্য্যের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। প্রবাসপ্রত্যাগত স্বামীর প্রতি কিংবা অন্যাকৃষ্টচিত্ত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম স্বকীয় হইয়াও পরকীয়। সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রেম স্বকীয় হইলেও পরকীয় মাধুর্য্যে পূর্ণ।

কারণজ্ঞানবিশিষ্টা ভক্তি অপেক্ষা কারণজ্ঞানশূন্যা ভক্তি শ্রেয়সী হইলেও জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। সাধনপোতে ভক্তি চালক-শক্তি কিন্তু জ্ঞান দিগ্দর্শন যন্ত্র। কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান না জন্মিলে তাহার প্রতি ভক্তি জন্মাইতে পারে না। যত দিন পর্য্যন্ত কোন মহাত্মার সম্বন্ধে লোক মুখে শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া কিছু জ্ঞান না হয় ততদিন আমরা সেই মহাত্মাকে ভক্তি করিতে পারি না। সেই হেতু প্রথমেই শুনিবার আদেশ করা হইয়াছে। ভগবান সম্বন্ধেও ঠিক

সেই প্রকার; তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হইলে আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারি না। যাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান হইতে পারে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি হইতে পারে। আকাশকুসুমের ন্যায় যাঁহার কোন জ্ঞানই আমাদের নাই তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিব? জীব ও ভগবানের প্রকৃতসম্বন্ধজ্ঞানই জ্ঞান। এই জ্ঞান না হইলে আমাদের সাধনা কি প্রকারে হইবে? ভগবৎ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান না হইলে আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারি না। ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধজ্ঞান জন্মিলেই যে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে তাহা নয়। কেবল জ্ঞান দ্বারাই হইবে না, ভগবানে প্রেমভক্তি চাই, জ্ঞানের সহিত ভগবানকে উপলব্ধি করা চাই।

অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় পদার্থতে সেই হেতু ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে না। যদি ভগবান অজ্ঞেয় হন তাহা হইলে তাঁহাতে কোন মতে ভক্তি জন্মিতে পারেনা। যদি কাহারও মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে ভগবান অজ্ঞেয়, তাহা হইলে তাহার সেই দার্শনিক মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ভক্তি অসম্ভব। কিন্তু জ্ঞাত অংশটুকুর জন্য অজ্ঞাত বস্তুর উপরও ভক্তি হইতে পারে। মানবে যখন কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে তখন সেই মহাত্মার মধ্যে বাঞ্ছনীয় গুণাবলীর জন্যই তাহাকে ভক্তি করা হয়। সেই হেতু ভক্তি উৎপত্তিকালে কারণমিশ্রা ও জ্ঞানজড়িতা। এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে অহৈতুকী বা কারণবিহীনা ভক্তিই বা কি প্রকারে হইতে পারে? কি প্রকারেই বা হইল? এবং তাহাই বা প্রশস্ত হইল কেন? ভক্তি উৎপত্তিকালে স্বভাবতঃ কারণজ্ঞানমিশ্রা হইলেও অভ্যাস হেতু ব্যক্তিগত হইয়া পড়ে। কতিপয় গুণের জন্য লোকে কোন মহাত্মাকে ভক্তি করে, কিন্তু যদি সেই মহাত্মার ব্যক্তিত্বকে

পরিত্যাগ করা হয় তাহা হইলে সেই গুণাবলীর সমষ্টিকে লোকে ভক্তি করেনা। স্বদেশপ্রাণতার জন্য মহাত্মা প্রতাপসিংহ পূজনীয় ও ভক্তি ভাজন, কিন্তু স্বদেশপ্রাণতা গুণটীকে কোন বিশেষ আকার প্রদান করিয়া ভক্তি করা হয় না। গুণের জন্য ব্যক্তিতে ভক্তির সঞ্চার হয়, পরে অভ্যাসের সহিত ভক্তি গুণজ্ঞানের সাহায্য অপেক্ষা করেনা; পরে জ্ঞাননিরপেক্ষ হইয়া ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে এই প্রকারে ভক্তি ক্রমশঃ অকারণ ও অহৈতুকী হইয়া পড়ে। সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে যে স্বামীকে ভক্তি করেন তাহা স্বামী বলিয়া. পরে কালক্রমে তিনি যখন স্বামীর গুণ সকল দেখিতে পান ও অনুভব করেন তখন তিনি স্বামীকে ভাল বাসিতে শিখেন; কিন্তু ভালবাসা বদ্ধমূল হইলে স্ত্রী আর বলিতে পারেন না যে তিনি কোন্ গুণের জন্য স্বামীকে ভাল বাসেন। তখন তিনি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। ভালবাসা তখন গঙ্গার জলস্রোতের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বালিকাবয়সে বিবাহের পর যদি বহুকাল পর্য্যন্ত স্বামিসন্দর্শন বা লোকমুখে শ্রবণ প্রভৃতি জন্য স্বামিসম্বন্ধে কোন জ্ঞান না হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই মহিলার হৃদয়ে স্বামীর প্রতি ভালবাসা জন্মায় না; কিন্তু অপর স্ত্রীলোকদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া বা অপর কোন সূত্রে স্বামী স্ত্রীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নৈকট্য অবগত হওয়াতে স্বামীকে ভাল বাসিবার জন্য ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হয়। স্বামীর পরিচয় পাইবার পর স্ত্রী তাহাকে ভাল বাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখেন। স্বামীর পরিচয় বা স্বামীর সম্বন্ধে জ্ঞানই ভক্তির কারণ। জ্ঞান হইতে উক্ত ভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া আবার জ্ঞাননিরপেক্ষা ও অহৈতুকী হইয়া পড়ে। এইরূপে কারণমিশ্রা ভক্তি হইতে অহৈতুকী ভক্তির বিকাশ হয়। ভক্তি প্রথম অবস্থায় জ্ঞানমিশ্রা কিন্তু যখন সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ গাঢ় ও শুদ্ধ হইতে থাকে আর তখন

জ্ঞান থাকেন।। রামানন্দ রায়ের সহিত ভক্তিসাধন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-দেবের যে কথোপকথন হয় তাহাতে রামানন্দ প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়, কিন্তু চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক তাহা বাহ্যসাধন বলিয়া উক্ত হওয়াতে রামরায় গীতায় নবম অধ্যায়ের যৎকরোষীতি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণকেই সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করেন। উহাও যখন চৈতন্যদেবের অভিমত হইল না তখন তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ে কথিত সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবচ্চরণই সাধ্য বলেন। তাহাতেও যখন চৈতন্যদেবের তৃপ্তি হইল না তখন রামরায় ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞানশূন্য ভক্তিকেই সাধ্য নিরূপণ করেন।

> জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
> জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
> স্থানস্থিতাং শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
> র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসিতৈ স্ত্রৈলোক্যম্॥

বৈষ্ণবমতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি প্রশস্ত, আবার দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টি প্রশস্ত। সচরাচর সাধকদিগের মধ্যে শান্ত ও দাস্য ভাবের উপাসনাই দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহাই অপেক্ষাকৃত সহজ। সখ্য বাৎসল্য ও মধুর অতি বিরল। ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান কিছুমাত্র থাকিবেনা, আত্মসমজ্ঞান অর্থাৎ কেবলমাত্র ভেদজ্ঞানটুকু থাকিবে অথচ তাহার স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ অনন্তত্ব প্রেমময়ত্ব জ্ঞানময়ত্ব অণুত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধগুণবত্ত্বজ্ঞানও বর্ত্তমান থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক না হইলেও সহজ নহে। নিজেকে পাল্য জ্ঞান করা স্বাভাবিক কিন্তু নিজে পালক ও

ভগবানকে পাল্য জ্ঞান, নিজে পিতা বা মাতার স্থানীয় এবং কোটী কোটী বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বর পাল্য সন্তান এই ধারণা স্বাভাবিক নয়। যেহেতু মানব প্রত্যেকপলে প্রতিক্ষণে প্রত্যেককার্য্যে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে সে যে অতি ক্ষুদ্র; তাহার বল জ্ঞান অতি সামান্য; মানব যেন অতি সামান্য কীটানুকীট মাত্র। এই মহান্ বিশ্বমাঝে মানব যেন সমুদ্রতীরে বালুকণা মাত্র। কোথায় এই অনন্ত শক্তিসমুদ্রবিশেষ ভগবৎসত্তা আর কোথায় দীনাতিদীন মানব! মানব সকল সময়েই জানিতে পারিতেছে যে সেই পাল্য, ভগবান পালক। মানবের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, কোন শক্তি নাই, কোন জ্ঞান নাই, ভগবানই সকল ক্ষমতা সকল জ্ঞান সকল শক্তির আধার, তিনিই শক্তি জ্ঞান ও প্রেম স্বরূপ। ইহাই স্বরূপ জ্ঞান, ইহাই স্বাভাবিক জ্ঞান। পৌরাণিক সময়ে যশোদা দৈবকী কৌশল্যা কুন্তী ও ঐতিহাসিক কালে শচী দেবী ও মালিনী এই কয়জন স্ত্রীলোক ও পৌরাণিককালে দশরথ বসুদেব ও নন্দ এবং ঐতিহাসিক সময়ে জগন্নাথমিশ্র পুরীগোঁসাই এই কয়জন বাৎসল্য ভাবে ভগবানকে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থানুসারেই তাঁহারা সকলে ভগবানের অবতারগ্রহণের সময় আবির্ভূত ছিলেন। ভগবানের অবতার ভাবে আবির্ভাবের সময় ভিন্ন অপর সময়ে বাৎসল্য প্রেমও প্রায় একেবারে বিরল। আবার উক্ত মহাত্মা ও মনস্বিনীগণ প্রায় সকল সময়েই মোহে আচ্ছন্ন হওয়ার জন্য ভগবানকে স্বীয়পুত্র বা পাল্য ভাবেই দেখিয়াছিলেন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভগবদ্ভাবে দেখেন নাই। কথিত আছে এক সময়ে যশোদাদেবী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে মৃত্তিকা বাহির করিতে গিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করেন, পরক্ষণেই আবার মোহাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে সন্তান ভাবেই উপলব্ধি করেন; সুতরাং বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে লৌকিকভাবে সখ্য

বাৎসল্য ও মধুর প্রেম অতি সুন্দর হইলেও ভগবানের প্রতি সেভাবের প্রেম স্থাপন করা অল্লায়াসসাধ্য নহে। এদিকে শান্ত দাস্থে প্রেমের আগ্রহ নাই, উৎকট নৈকট্যস্পৃহা নাই, প্রাণের সে তীব্র ব্যাকুলতা নাই। শান্ত ও দাস্থ উপাসকের ভগবান মহান্, অন্তহীন, অনন্ত কোটী কোটী বিশ্বের ঈশ্বর; কিন্তু প্রেমিকের কাছে ঈশ্বর কেবল তাহা নন। ভগবান প্রেমিকের প্রেমাস্পদ, তাহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন।

আশ্রয়ের প্রতি আশ্রিতের যে আকর্ষণ তাহাকে ভক্তি বলা হয়, ও আশ্রয়ের আশ্রিতের প্রতি আকর্ষণ স্নেহ নামে অভিহিত। আকর্ষকের আকৃষ্টের প্রতি প্রেম স্নেহ, ও আকৃষ্টের আকর্ষকের প্রতি প্রেম ভক্তি। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা স্নেহজড়িত ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা ভক্তিমিশ্রিত। পুত্রের প্রতি মাতার ভালবাসা স্নেহপূর্ণ, পুত্রের মাতার প্রতি ভালবাসা ভক্তিপূর্ণ। প্রেমেতে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে প্রায় সমান করিয়া আনে। কিন্তু যতই সমান করিতে চেষ্টা হউক না কেন মানবাত্মা ও ভগবানে সহকার ও মাধবীলতার ন্যায় সম্পর্ক, এবং এই সম্পর্ক অতি মধুর; এই কারণ বশতই বোধ হয় বৈষ্ণবেরা মানবাত্মাকে স্ত্রী ও ভগবানকে পুরুষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানকে প্রভু ভাবে উপাসনা করা প্রায় সমস্ত উন্নত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত; কিন্তু পিতৃভাবে উপাসনা করা তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের, অনেক প্রীতিপ্রদ ও মধুর। পিতৃভাবে উপাসনাতে শান্তের স্বরূপোপলব্ধি, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচ ব্যবহার সকলই আছে। বৈষ্ণবমতের বাৎসল্য প্রেমে যাহা কিছু আছে তাহার সমুদায়ই ভগবানকে পিতৃভাবে উপাসনায় আছে। অধিকন্তু পিতৃভাবে উপাসনা স্বাভাবিক, যেহেতু পিতা পালক সন্তান পাল্য, ভগবান পালক জীব পাল্য। জীব যখন

অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিতে থাকে তখন সে তাহার পুত্রের কাছে কাঁদিয়া পড়ে না, স্বভাবতই তাহার পিতামাতাকে সেই সময় মনে পড়ে, তাই 'মাগো' 'বাবাগো' বলিয়া উঠে। যখন প্রাণে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, যখন প্রাণের যাতনায় মানব অস্থির হইয়া পড়ে, তখন মানব তাহার মাতা কিংবা পিতারই আশ্রয় লয়। পাপ প্রলোভন প্রভৃতির সহিত সংগ্রামে কখনও মানবে জয় লাভ করে, কখন বা পরাজিত হইয়া কাতর ভাবে শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করে। এই প্রকারে পাপ প্রলোভনের সহিত জীবন সংগ্রামই ধর্ম্মজীবন। ইহাই মনুষ্যত্ব। একবার উঠিবে আবার পড়িবে, আবার উঠিবে ইহাই ধর্ম্ম-জীবন। পরাজিত হইলে সাধক শক্তি ও প্রেমস্বরূপ পিতৃ বা মাতৃভাবে উপাস্য ভগবানের কাছে কাতরভাবে শক্তি ভিক্ষা করেন। প্রার্থনার দ্বারা হৃদয়ে বলের সমাবেশ হইলে মানব আবার সেই পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে ও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। ভগবানকে পিতৃভাবে কিম্বা মাতৃভাবে উপাসনা করা যত স্বাভাবিক ভগবানকে অপর কোনভাবে উপাসনা করা তত স্বাভাবিক নয়। মাতৃ-ভাবে বা পিতৃভাবে ভগবানের উপাসনাতে মাতা বা পিতা পাল্য নহেন পালক, সন্তান বা জীবই পাল্য। মাতা ও পিতা জ্ঞান প্রেম ও শক্তির আধার; কিন্তু বাৎসল্যভাবে ভগবদুপাসনায় তাহা নয়। ভগবানকে পিতৃভাবে উপাসনা করা অপেক্ষা মাতৃভাবে উপাসনা করা বোধ হয় আরও মধুর ও শান্তিপ্রদ। ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা করা যে কেবলমাত্র শাক্তদের নিজস্ব তাহা নয়। বৈষ্ণব মহাত্মগণও ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা করেন। নারদপঞ্চরাত্রে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি রাধিকাকে জগন্মাতা বলিয়া তাঁহার পূজাবিধি কথিত আছে।

আদৌ সমুচ্চরেৎ রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
কৃষ্ণো হি জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শত গুণং মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী॥

মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের নিজস্ব। শান্তিপর্ব্বে ভগবানকে "পিতা মাতাচ জগতঃ শাশ্বতো গুরুঃ" বলা হইয়াছে।

মাতৃভাবে ভগবদুপাসনাতে বৈষ্ণবমতোক্ত মধুর প্রেমের অভিমান টুকু সম্পূর্ণ আছে। স্বামিরূপী ভগবানের উপর ভক্ত যেমন অভিমান করেন, সন্তানও কষ্টের সময় কখনও তাঁহার উপর রাগ করেন, কখনও বা অভিমান করেন, কখনও বা ব্যাকুল হইয়া কাঁদেন। অভিমান ভরে সন্তান বলেন "মা তোরে আর ডাকৃব কত, আমার কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত, কাণের মাথা খেয়ে শুনিস্ না মা তাকি"। সন্তান যখন ডেকে ডেকেও সাড়া পায় না তখন বলে "মা মা ব'লে আর ডাকৃব না, ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা"। সন্তানের যাবতীয় অভিযোগ যত অভিমান সকলই মার উপর, তাই সন্তান কাঁদিয়া বলেন—

"আর কারে ডাকবো গো মা,
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।"

বৈষ্ণবমতোক্ত স্বামিভাবে ভগবানকে উপাসনা করা স্বাভাবিক বটে কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ। মাতৃভাবে উপাসনা স্বাভাবিক ও সহজ। ভক্তে বলেন "মা! পৃথিবীতে তোমার অনেক পুণ্যবান্ সন্তান আছে, আমি পাপী বলিয়া আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। মাগো! কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখন নয়।"

সন্তান মার কাছে আবদার করে, অভিমান অভিযোগ করে, এমন কি তর্কযুক্তি পর্য্যন্তও করে। সন্তান বলে "মা আমাকে ত্যাগ করিলে লোকে যে তোমাকে নিন্দা করিবে।" ভক্ত ভগবানকে ভয় পর্য্যন্তও

দেখান, বলেন আমাকে যদি উদ্ধার না কর তাহা হইলে আমার আর বিশেষ ক্ষতি কি? লোকে তোমার অভয়তারণ দুর্গানাম কাশীমোক্ষ ধামের নামও কেহ করিবে না। ভগবানের অনন্ত দয়াতে অচল বিশ্বাস হেতু বৈষ্ণবকবি গৌরসুন্দর ঠিক পূর্ব্বোক্ত ভাবে বলিলেন ঃ—

"রাধানাথ! লোকে বা হাসয়ে তোমা,
যে কহে তোমার তারে না তরাইলে,
অযশ রবে ঘোষণা।"

আর একজন ভক্ত কবি গাইয়াছিলেন ঃ—

"এ বিপাকে আমি মলে, দেহযাত্রা শেষ হোলে।
দয়াল নাবিক বলে কে ডাকিবে আর হে॥"

পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস বলিলেন ঃ—

তুমি ত করুণাসিন্ধু, পাতকী জনার বন্ধু
এবার করহ যদি ত্যাগ।
পতিতপাবন নাম নির্ম্মল সে অনুপাম
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ॥

ভক্ত কাম ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি যাহা কিছু করিবার আছে তাহা তাহার ভগবানের উপরই করেন। ভালবাসেন ভগবানকে, রাগ করেন ভগবানের উপর, অভিমান করিবার ও সেই ভগবান। নারদ সূত্রে উক্ত আছে "তদর্পিতাখিলাচারেণ কামক্রোধাভিমানাদিকম্ তস্মিন্নেব করণীয়ম্"। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বোধসার গ্রন্থের লয়প্রকরণে ভক্ত কিভাবে তাহার বাহ্য ও আন্তরিক জীবন ভগবানে উৎসর্গ করেন তাহা সুন্দররূপে কথিত আছে। সন্তান মোক্ষ চায় না, মুক্তি চায় না, কেবল চরণতলে বসিয়া থাকিতে চায়,

মা বলিয়া ডাকিতে চায় এই তার আশা, এই আকাঙ্ক্ষা। সন্তান বলেন, 'মা! আমি আপদ উপস্থিত হওয়াতে তোমাকে ডাকিতেছি, সম্পদের সময় ডাকি না, তাই বলে মা তুমি মনে করিও না যে আমি তোমাকে এখন প্রাণের সাহিত ডাকিতেছি না। মাগো! "ক্ষুধাতৃষ্ণার্ত্ত সন্তানই জননীকে স্মরণ করে।" মার উপর সন্তানের অটল বিশ্বাস। ভক্তের পাপবোধ যেমন জ্বলন্ত, নির্ভর ও তেমনি ঐকান্তিক। ভক্ত বলেন, "মাগো! আমার মতন পাপী নাই, কিন্তু মা তোমার মতন পাপঘ্নী ত আর নাই, মা! ইহা জানিয়া তুমি আমার পক্ষে যাহা ভাল হয় করিও।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা করাই শ্রেয়ঃ। যাহাহউক্ সাম্প্রদায়িক ভাবে ভক্তি ব্যাখ্যা করা আমার অভিপ্রায় নয়, সাধারণ ভাবে ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যৎসামান্য উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য। কেহ বলিতে পারেন যে ভগবানের স্ত্রীমূর্ত্তি কল্পনা করা অযৌক্তিক। এই প্রকার সন্দেহ স্থলে আমার বিশ্বাস যে, ভক্ত ভগবানের স্ত্রী বা পুরুষ কোন মূর্ত্তিই কল্পনা করেন না— ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা করেন। ভগবানকে পিতৃ ভাবে উপলব্ধি করা যতদূর যুক্তিসঙ্গত মাতৃভাবে উপলব্ধি করাও ততটা যুক্তিসিদ্ধ; যেহেতু তিনি স্ত্রীও বটে পুরুষও বটে, আবার স্ত্রীও নন পুরুষও নন। ফলতঃ ভগবান বিরুদ্ধগুণের অদ্ভুত সমাবেশ মাত্র। রামরসায়নের কবি লিখিয়াছেন।

কেশ কোটী ভাগ হৈতে তোমার অণুত্ব।
মহাকাশ হৈতে পুন দেখি যে বিভুত্ব॥
অতি দীর্ঘ অতি হ্রস্ব গুণী গুণাতীত।
ইত্যাদি বিরুদ্ধ নানা গুণেতে শোভিত॥

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত কথাটি সপ্রমাণ হয়।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।"

ভগবানকে যে যে ভাবে উপাসনা করিবে সে সেই ভাবে তাঁহাকে পাইবে। যাহা হউক্ কাহার পক্ষে কি ভাবে উপলব্ধি করা সহজ ও কর্ত্তব্য, কাহার মনের গঠন কি প্রকার, ইহা জানিতে হইলে একটু বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমে দেখিতে হইবে যে সাধক সংসারের উক্ত কয় প্রকার প্রেমাস্পদের মধ্যে কাহার প্রতি প্রেমে অধিক আনন্দ ও শান্তি পান, কোন প্রকার প্রেমজনিত আনন্দ ও শান্তি তাহার হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী ও বিমল হয়। সাংসারিক কষ্ট যন্ত্রণা প্রভৃতিতে কোন প্রকার প্রেম তাহার প্রাণে শান্তি দেয়? কাহার কাছে যাইলে, কি করিলে তিনি যন্ত্রণা কষ্ট হইতে উদ্ধার পান? যে প্রকার প্রেমজাত আনন্দ বিমল ও অধিকক্ষণ স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত বিক্ষেপবিহীন হইবে, সাধকের পক্ষে ভগবানকে সেই ভাবে উপাসনা করাই বিধি। তবে আমার বিশ্বাস যে যতই আত্মহারা হউন না কেন, সাধকের মনে এই ধারণা থাকা প্রয়োজন যে সাধক ও সাধ্য, জীব ও ঈশ্বর ইহাদের মধ্যে জীব পাল্য ও ভগবান পালক, মানব সৃষ্ট ভগবান স্রষ্টা, মানব সান্ত ভগবান অনন্ত। ভক্তি পথ প্রবৃত্তিমার্গ। পুত্রহারা জননীকে যদি বলা হয় সংসার কিছুই নয় সবই ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রমমাত্র, অতএব আত্মানুসন্ধানকর; পুত্র সকলকারই মরে, তোমার অদৃষ্টে পুত্রশোক ছিল তাই তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—কর্ম্মফলবশতই মৃত্যু হইয়াছে, অতএব বৃথা শোক না করিয়া ভগবানকে ডাক। মহাভারতে গৌতমীর প্রতি সম্ভাষিত এই উপদেশ কি সেই মহিলার পুত্রশোক নির্ব্বাপিত করিবে? মহাত্মা বুদ্ধদেব

পুত্রহারা মহিলাকে যে ভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাতে কি তাহার পুত্রশোক দূর হয়? কিংবা যদি তাহাকে বলা হয় সকল সংসারেই মৃত্যু রহিয়াছে, মৃত্যু স্বাভাবিক, তাহাতে কি তাহার প্রাণে শান্তি আসে? সে কি সেই শুষ্ক উপদেশে ভগবানকে ডাকতে পারে? যদি কখনও চেষ্টা করে তখনই তাহার সেই মৃত-পুত্রের মুখখানি মনে পড়ে, তাহার পূজা বিড়ম্বনা হয়। বৈরাগ্য শোকোপনদনের একটী উপায় বটে, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়। পুত্রশোক সহজে দমন করা যায় না, এমন কি দমন করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করা কঠিন। কিন্তু যদি তাহার মনে এই ধারণা হয় যে তাহার স্নেহের পুত্তলি এখন নিত্য, সকল সময়েই তাহার কাছে কাছে রহিয়াছে; তাহার সন্তানের এখন আর বিকার নাই, ক্ষয় নাই, মৃত্যু নাই, তখন তাহার মনে আর কষ্ট থাকে না। তখন তাহার ঈশ্বরারাধনা সহজ ও তৃপ্তিপ্রদ হয়, তাহাতে তাহার দুঃখেতেও সুখ উৎপন্ন হয়। প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় সন্তান বা স্ত্রী বা অন্য কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে যখন যন্ত্রণায় হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইতে থাকে তখন শুষ্ক জ্ঞান বা বৈরাগ্য হৃদয়ে শান্তি দিতে পারে না। তখন একান্তমনে ভগবানের নাম জপ করিলে বা কীর্ত্তন করিলে প্রাণে শান্তি আসে, তখন "নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি।"

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ইহা এক প্রকার স্থির যে সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ইষ্টা পূর্ত্তাদি নিখিল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বলিয়া হৃদয়ে ধারণা ধ্যান ও উপলব্ধি করতঃ ঐকান্তিক অব্যভিচারি অহৈতুক প্রেমের সহিত তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেই একনিষ্ঠ হইয়া

তাঁহার উপাসনা করা ও হৃদয়ে বলসমাধানার্থ কাতরে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করাই সংসারনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবানের সত্য মঙ্গল জ্ঞান প্রেম শক্তি স্বরূপ হৃদয়ে নিরন্তর ধারণা পূর্ব্বক বিনা উদ্দেশ্যে ও বিনা সংকল্পে ঈশ্বরারাধনা যেমন ধর্ম্মজীবনে উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়, সেইরূপ প্রার্থনা ও বিশ্বাস এই দুইটি ধর্ম্মজীবনের ভক্তি সাধনার মূলভিত্তি।

মনুষ্যজীবন সংগ্রামময়। সংগ্রামপূর্ণ জীবনই উন্নতিশীল। সমুদ্রের একটী তরঙ্গ বেলাভূমির উপর সবেগে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে না যাইতে যেমন আর একটী তরঙ্গ আসিয়া উপনীত হয়, সেইরূপ একটী প্রলোভনের পর আর একটী প্রলোভন মানব হৃদয়ে মহাবেগে উত্থিত হইয়া মানবকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে। তরঙ্গের যেমন বিরাম নাই, প্রলোভনেরও বিরাম নাই। এই ঘাত প্রতিঘাত লইয়াই মানবজীবন। যে জীবনে সংগ্রাম নাই, পাপ প্রলোভনের সহিত অহর্নিশ দ্বন্দ্ব নাই, সে জীবন কোন কালে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মানবকে দিবারাত্র অনুক্ষণ কাম ক্রোধাদির সহিত, স্বার্থপরতা ও নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এইরূপে পাপ প্রলোভন প্রভৃতির সহিত অহর্নিশ দ্বন্দ্ব করিতে করিতে হৃদয়ে শক্তির সমাবেশ হয়। সেই ভীষণ সংগ্রামে কখনও বা মানব পরাজিত হয়, কখনও বা সে শত্রুগণের উপর জয়লাভ করে। যাহার জীবনে এই সংগ্রাম নাই তাহার মানবজীবন বৃথা। সংগ্রামে জয় হইলে গর্ব্ব বা পরাজয় হইলে নৈরাশ্য কোন মতে উচিত নয়। মানব যখন সংগ্রামে বিজিত হইয়া বিশীর্ণ হৃদয়ে প্রাণের যন্ত্রণায় কাঁদিতে থাকে, যখন কাতরভাবে তাহার ভগবানের কাছে বলিতে থাকে 'ভগবন্! আমি আর যে পারি না, দুর্দ্দান্ত প্রবল রিপুদের সহিত আর যে সংগ্রাম

করিতে পারি না, ভগবন্! তুমি এখন কোথায়? একবার আসিয়া আমার অবস্থা দেখ। আমাকে রক্ষা কর, একবার প্রাণে স্বর্গীয় বল দাও! মাগো! শক্তি দাও মা। নচেৎ তোমার দীনহীন সন্তান একে-বারে বিনষ্ট হয়।" এই কাতর আর্ত্তনাদের নাম প্রার্থনা। সাধক যখন পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে অবশ ও অপারগ হইয়া কাতরভাবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার ভগবানের নিকট হইতে শক্তি ভিক্ষা করেন তখনি তাহায় হৃদয়ে কোথা হইতে যেন অভিনব স্বর্গীয়বলের সঞ্চার হয়; তিনি অনায়াসে সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া পাপ প্রলোভনকে পরাজিত করেন। প্রার্থনার মতন হৃদয়ের জ্বালা নিবারক এমন ঔষধী আর নাই। তখন ভগবানকে ডাকার মত শান্তির উপায় আর নাই।

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

ভাগবত ১২।৪.৪০॥

যতই যন্ত্রনা হউক না কেন, একবার ভগবানের কাছে কাঁদিয়া পড়, তৎক্ষণাৎ সকল যন্ত্রণা সকল ব্যথা দুরে যাইবে, প্রাণে শান্তি আসিবে। শক্তিলাভের জন্য এই প্রার্থনা মানবজীবনের চির সঙ্গিনী, নিশ্বাস বায়ুর ন্যায় প্রয়োজনীয়া। পাপ প্রলোভন যেমন মানবজীবনের চিরসঙ্গী, শক্তি ভিক্ষা রূপ প্রার্থনাও সেই প্রকার আজীবনসঙ্গিনী হওয়া উচিত। অত্যন্ত যন্ত্রণার সময় প্রার্থনাই কেবল হৃদয়ে শান্তিআনন্দ প্রদান করিতে পারে। সাধকের হৃদয়ে তীব্র পাপজুগুপ্সা ও ভগবৎ প্রেমে অচল বিশ্বাস

এই দুইটি এক কালে বিদ্যমান থাকে। যে নিশ্বাসে ভক্ত বলিতেছেন "অপরাধ পাপ মোর তাহার নাহিক ওর" সেই নিশ্বাসেই বলেন "উদ্ধারহ নিজ করুণায়"। পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইলেই ধর্ম্মজীবন একেবারে নষ্ট হয় না। উত্থান ওপতন,পতন ও উত্থান লইয়াই ধর্ম্মজীবন। পতনের পর যদি উত্থানের আর চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে ধর্ম্মজীবন নষ্ট হইল। প্রলোভনে গা ভাসান দিলেই ধর্ম্মজীবন নষ্ট হইল। পরাজয়ের পর যদি প্রার্থনা করা না হয় তাহা হইলে সেই শুষ্ক হৃদয়ে কখনও ভক্তি প্রবেশ করিতে পায় না। জয় পরাজয় ত আছেই, প্রার্থনাই মনুষ্যত্ব। পাপ প্রলোভনাদিকে পরাজয় করিতে পারিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, প্রাণে নিরতিশয়আনন্দ উপস্থিত হয়। আপনাপনি প্রাণের ভিতর হইতে স্তুতি ও বন্দনা বাহির হয়,স্বতঃই মনে হয় "ধন্যোঽস্মি কৃতকৃতার্থোঽস্মি"। প্রাণের ভিতর হইতে আপনাপনি কে যেন বলিয়া উঠে, "ভগবন্! তুমি আজ আমাকে রক্ষা করিলে; আমি দুর্ব্বল, আমি কাতর, তাই আমাকে তুমি বাঁচাইলে"। মহাবিপৎসঙ্কুল স্থান হইতে যদি কেহ ভাগ্যক্রমে নিরাপদে ফিরিয়া আসে তাহার মনে যে প্রকার ভাব হয়, প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিলে সাধকের হৃদয়ে সেই প্রকার ভাব হওয়া উচিত। পর্ব্বতসানুবিচারী পথিকের পদতলস্থ প্রস্তরময়ী ভূমি যদি অকস্মাৎ ধীরে ধীরে সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইবার মতন হইতেছে এমন সময় সেই সৌভাগ্যবান পথিক কোন পুণ্যবলে লম্ফপ্রদানে নিরাপদ স্থানে উপনীত হয়, তখন তাহার মনে কি আত্মগরিমা উপস্থিত হয়? পুণ্য বা অদৃষ্ট বা ভগবদনুকম্পা বশতঃ প্রলোভনজয়ী সাধকের হৃদয়ে উক্ত পথিকের মত ভয় ও আনন্দ জড়িত এক অভিনব সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক হয়। যদি ভগবৎকৃপায়, সাধক সংগ্রামে পাপ প্রলোভনকে জয় করিতে পারেন তাহা

হইলে তাঁহার হৃদয়ে আত্মগরিমা হওয়া কদাপি উচিত নয়। তাঁহার মনে এরূপ ভাব হওয়া উচিত নয়, যে আমি স্বীয় পুণ্যবলে পাপ প্রলোভনকে জয় করিলাম। "আমি ধর্ম্মপথে অনেক অগ্রসর" এই ভাবটি সাধকমাত্রের সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। এই আত্মগরিমার ন্যায় ভয়ানক শত্রু আর নাই। ইহা প্রকাশ্য শত্রু নয়, ইহার গতিবিধি রোগী নিজেই জানিতে পারেন, অপরে সহজে পারে না; সেই হেতু ইহা অতি ভয়ানক। ধর্ম্মজীবন ও সাধনাকে একেবারে সমূলে নষ্ট করিতে ইহার মতন আর কিছুই নাই। অবিশ্বাসের ন্যায় আত্মগরিমাও একেবারে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আত্মনির্ভর ও আত্মগরিমা দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। সংগ্রামে নৈরাশ্য ও গর্ব্ব দুইটীই অবিশ্বাস বটে, কিন্তু আত্মগরিমার মতন শত্রু সাধনপথে আর নাই।

বিশ্বাস ও প্রার্থনা যেমন ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি ও অবলম্বন, সেইরূপ আত্মচিন্তা ও আত্মানুসন্ধান প্রার্থনার মূল ও অবলম্বন। এই আত্মচিন্তা বৈদান্তিক অর্থে ব্যবহৃত আত্মদর্শন নহে; ইহা লৌকিক আত্মপরীক্ষা বা আত্মানুসন্ধান। প্রকৃত আত্মচিন্তা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন ও প্রার্থনা বালুকার উপর গৃহনির্ম্মাণ করা মাত্র। প্রথমে অতি ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার সহকারে দেখিতে হইবে যে হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা কি, নিজের কাছে কপটী হওয়া অতি ভয়ানক। মনের অগোচর পাপ নাই। মানসিক দৌর্ব্বল্য ও পাপ মনের অজ্ঞাত নাই। রোগী যত কাল পর্য্যন্ত নিজের পীড়ার বিষয় না জানিতে পারিল, ততদিন তাহার রোগ নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মদোষ আপনার কাছে স্বীকার করিলে মনে স্বাভাবিক অনুশোচনা উপস্থিত হয়। হৃদয়ের কোন্ অংশ দুর্ব্বল, কোন্ অংশ দোষস্থ এই আত্মচিন্তা প্রথমতঃ অত্যন্ত কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক বোধ হয়। আত্মচিন্তার পর স্বীয় দোষ, দুর্ব্বলতা ও পাপ দেখিয়া প্রকৃত

মনুষ্যত্ববিশিষ্ট সাধক নিজের ভারেই যেন নিজে কাঁপিতে থাকেন। এই গভীর আত্মচিন্তা ও তজ্জনিত পাপবোধ ও পাপস্বীকার ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। আর্য্য-মহাত্মগণের দর্শপৌর্ণমাসী যজ্ঞের অনুকরণে মহাত্মা বুদ্ধদেব প্রতিমোক্ষ বিধান করেন। প্রত্যেক একাদশীর দিন মণ্ডলী সমবেত হইলে ঋত্বিক্ মণ্ডলীর মধ্যে অপরাধ ও পাপ সকলের নাম পাঠ করিতেন, এবং মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কোন প্রকারের পাপ করিয়াছেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। সেই সভায় পাপীরা পাপ স্বীকার করিতেন। হৃদয়স্থ দোষ সকল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা কোন ক্রমে উচিত নয় এবং উহা স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আদিম্বৌদ্ধশাস্ত্রে উক্ত পাপ-বোধ ও অনুতাপের উপকারিতা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা আছে, কিন্তু তদ্ধেতু প্রার্থনা করিবার অনুশাসন নাই, মণ্ডলীর মধ্যে স্বীকার করিবার আদেশ আছে মাত্র। কৃত পাপের জন্য হৃদয়ে অনুতাপ উপ-স্থিত হইলে তখন হরিস্মরণ করিলে সাধক পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে,—

কৃতপাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈব শ্রীহরিস্মরণং পরম্॥ ২।৬।৩৬

যখন কৃত ও অকৃত পাপের জন্য প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তখন বোধ হয় তাইত কি হবে? এই মলিন হৃদয় লইয়া আমি কেমন করিয়া ভগবানের আরাধনা করিব? এইত দুর্ব্বল হৃদয়, একটা প্রলোভনের ঝড় আসিবে আর কোথায় লইয়া ফেলিয়া দিবে। "এই হৃদয় লইয়া এই পঙ্কিল পাপপূর্ণ অন্তঃকরণ লইয়া আমি কিরূপ ভগবানের কাছে দাঁড়াইতে সাহস করি।" হৃদয়ে দৌর্ব্বল্যজ্ঞান প্রবল থাকার জন্য ভক্ত অকৃত পাপের জন্যও প্রাণে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করেন। মনে হয় আমার হৃদয়ত অতি দুর্ব্বল, হয়ত কি

পাপ কার্য্য করিয়া ফেলিব। আত্মচিন্তার পর প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়। আত্মচিন্তার ফল পাপবোধ ও দৌর্ব্বল্য জ্ঞান। সেই পাপবোধ ও দৌর্ব্বল্য জ্ঞান হেতু হৃদয়ে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সেই পাপবোধ ও দৌর্ব্বল্যজ্ঞানহেতু যন্ত্রনার বিশল্যকরণী প্রার্থনা। ভগবানের কাছে কাঁদিয়া পড়াই, কাতরে শক্তি ভিক্ষা করাই অর্থাৎ পাপ-বিমোচনপ্রার্থনাই সেই যন্ত্রণানিবারণের একমাত্র উপায়। আত্ম চিন্তার পরে হৃদয়ে যখন পাপবোধ প্রবল হয় তখন সাধক বলেনঃ—

পাপানলে সদা জ্বলি কার বলে হব বলী।
তুমি বিনা কারে বলি কে আছে আমার॥

এই উৎকট পাপ বোধের সময় কাঁদিয়া বলিলেন—

"মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই
নরোত্তমপাবন নাম ধর।"

শিশু যখন কোন ভারী জিনিষ অনেক চেষ্টাতেও তুলিতে না পারিয়া কাতর ভাবে মায়ের মুখের পানে চায় সেই কাতর দৃষ্টিই প্রার্থনা। প্রার্থনার কোন ভাষা নাই, কোন ছন্দ নাই। প্রার্থনার ন্যায় আর বন্ধু নাই। ভক্ত যখন সাংসারিকতা কিংবা পাপ প্রলোভনের সহিত সংঘর্ষে শক্তিহীন হইয়া কাতর নয়নে ভগবানের দিকে চান সেই কাতরতার তুলনা নাই, সে কাতরতার তুল্য সুখ নাই। কেবল বিশ্বাসী সাধক সেই কাতরতার মধ্যে সুখের ও শান্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন। প্রার্থনার পর প্রাণে স্বর্গীয় বল স্বর্গীয় আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রাণে শান্তি বিরাজ করিতে থাকে, তখন উপাসনা ও আরাধনা করিতে সাহস হয়। আত্মপরীক্ষা ও প্রার্থনা সাময়িক কার্য্যবিশেষ নয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় মানবজীবনের অত্যাবশ্যক বস্তু। ইহারাই উপাসনা ও ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি।

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতে অশুভ ভাবনাই পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিবার প্রধান অস্ত্র। নিরন্তর জরাব্যাধি মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করাকেই বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রে অশুভ ভাবনা বলে (দীর্ঘনিকায়-দ্বাবিংশতি সূক্ত)। মৃত্যুত নিকটে, মৃত্যুর সময় সংসারের পরিবার পরিজনকে ছাড়িবার সময় অত্যন্ত কষ্ট হইবে, তখন আর কে সঙ্গে থাকিবে?—

মরণক বেরি, কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায়।
এ হরি বন্ধো তুয়া পদ নায়। বিদ্যাপতি।

মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা অতি ভয়ানক যন্ত্রণা। মৃত্যুর পর যন্ত্রণা তাহা অপেক্ষা আরও বেশী। অতি ভীষণ যন্ত্রণাপূর্ণ নরক ও পরকাল। মৃত্যু—পরকাল—যন্ত্রণা এই ভাবনা সকল নিরন্তর ভাবিতে ভাবিতে মানবের ভোগলিপ্সা মৃতপ্রায় হইয়া যায়। মানবে আর পাপ পথে যাইতে পারে না। প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইলেই মৃত্যুর ছায়া তখনি আসিয়া বলে "সাবধান, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় আছি।" তখন মানবের হৃদয় হইতে প্রলোভন দূরে চলিয়া যায়। উক্ত প্রকার মৃত্যু ভাবনা দ্বারা পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করাতে পাপ প্রলোভনাদিকে জয় করা যায় বটে কিন্তু এতদ্বারা মানবহৃদয়ের অনেকগুলি বাঞ্ছনীয় গুণ প্রনষ্ট হয়। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সাহস থাকে না. দয়া প্রেম সহানুভূতি প্রভৃতি দেবদুর্ল্লভ গুণ সমুদায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কিন্তু মুদিত ভাবনা কিংবা নিত্যভাবনা দ্বারা পাপ প্রলোভন জয় করাও যায়, এবং হৃদয়ে নিরন্তর শান্তি ও আনন্দ উপলব্ধি হয় ও দয়া প্রেম প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি পায়। যাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছে যে ভগবান সকল সময়েই তাঁহার কাছে কাছে আছেন, সে ব্যক্তির নিকটে পাপ

প্রলোভন সহজে আসিতে পারে না, অথচ সেই মহাত্মা ভগবানকে নিরন্তর প্রাণের কাছে পাইয়া প্রাণের প্রাণরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া শাশ্বত শান্তি ভোগ করিতে থাকেন। প্রেমিক তাই আনন্দের চরম সীমাতে উপনীত হইয়া বলিলেনঃ—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

সংগ্রামের সময় প্রার্থনার যেমন প্রয়োজন, বিশ্বাসেরও সেই প্রকার প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবনে বিশেষতঃ সংগ্রামকালে বিশ্বাস যেন অভেদ্য কবচ। বিশ্বাসী কখনও নিরাশ হয় না। প্রার্থনার সময় বিশ্বাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিশ্বাসী সাধক জানেন যে ভগবান তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, কখনও করিবেন না। তিনি যে দয়াময় দীনবন্ধু, তাঁর মত পাপঘ্ন যে আর কেহ নাই। আমার পাপ সান্ত, তাঁর প্রেম যে অনন্ত। তিনি আমাকে শক্তি দেবেনই; তিনি বিপদে আমাকে তাঁহার অভয় কোলে তুলিয়া লইবেনই। যখন সাধকের প্রাণে এই বিশ্বাস প্রবল থাকে তখন তাহার সেই কাতর অশ্রুপূর্ণ প্রার্থনা সেই সময়েই পূর্ণ হয়। সাধক হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব বল পান। তখন সাধক সেবা করিবার ও উপাসনা করিবার সামর্থ্য পান ও উপাসনা করিতে করিতে স্বরূপ উপলব্ধি ও রসাস্বাদন করিতে থাকেন।

স্বরূপানন্দ ও শান্তি লাভ করিবার জন্য বিশ্বাসই অন্যতম মূল। যদি ভগবানের প্রেমে বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে সে জীবন প্রকৃত ধর্ম্মজীবন নহে, সে উপাসনা আরাধনা কিছুই নহে বৃথা শ্রম মাত্র। প্রার্থনা ও বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ঐকান্তিক নির্ভরের সহিত ভগবানের আরাধনা করাই ধর্ম্মজীবন উন্নত করিবার প্রধান ও

একমাত্র উপায়। বিশ্বাসীর হৃদয় আশাতে পূর্ণ। প্রেমিকের হৃদয় নিষ্কাম—নিষ্কাম প্রেমিকের হৃদয়ে চির-বসন্ত। প্রেমিক বিশ্বাসী জানেন যে তাঁহার ভগবান উপযুক্ত সময়ে তাঁহার হৃদয়ে বল প্রদান করিবেনই, এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তিনি প্রার্থনা করেন। পরন্তু প্রেমিকের বিশ্বাসই শক্তি, বিশ্বাসই আশ্রয়। প্রেমিক সাধক স্থির জানেন যে একবার ভগবানের নাম প্রাণের সহিত করিতে পারিলে শত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। বিশ্বাসীর প্রকৃত বিপদ নাই, সকল সময়েই তিনি বিপদ হইতে বিশ্বাস ও প্রার্থনার সাহায্যে সুফল লাভ করেন। বিপদ বিশ্বাসীর ধর্ম্মজীবনের হানি না করিয়া তাহার ধর্ম্মজীবনের উন্নতি বিধান করে। ধর্ম্মজগতে অবিশ্বাসীর যত ক্লেশ বিশ্বাসীর তত আনন্দ তত সুখ। বিশ্বাসী প্রেমিক কাহা হইতেও ভয় পান না, কাহারও ভয়ের কারণ হন না। ধর্ম্মজীবনের উন্নতি সাধনে বিশ্বাস যেমন মিত্র, অবিশ্বাসও তেমনি ঘোরতর শত্রু।

ধর্ম্মজগতে অনেক প্রকার অবিশ্বাস আছে; তাহাদের মধ্যে আত্ম গরিমা একটী ভয়ানক অবিশ্বাস। আত্মনির্ভরের অল্পতা বা অভাব আর এক প্রকারের অবিশ্বাস। সাধক অনেক সময়ে মনে করেন আমার দ্বারা এই কার্য্য, এত গুরুতর কার্য্য কখনও হইতে পারে না, আমার শক্তি বা সামর্থ্য নাই; এই প্রকার মনে করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হন। সাধকের এই প্রকার ভাব হইবার কারণ এই যে তিনি মনে করেন যেন সকল শক্তির আধার মানব নিজেই। এই প্রকারের অবিশ্বাসও পরিত্যাজ্য। ভগবানই যাবতীয় শক্তির আধার। ভগবানের শক্তি ভিন্ন অগ্নির এমন ক্ষমতা নাই যে একটী তৃণকে দগ্ধ করে, বায়ুর এমন ক্ষমতা নাই যে একটি তৃণকে এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যায়। সেই ভগবানই যখন আমাদিগকে প্রেরণ করিতেছেন তখন

তিনি পারেন না কি! নিজের দৌর্ব্বল্যের সহিত ভগবানের শক্তি ও ভালবাসার উপর বিশ্বাস বর্ত্তমান থাকা উচিৎ। আমি যতই দুর্ব্বল হই না কেন, আমি ত আমার নিজের শক্তিতে কার্য্য করিতেছি না। অপর পক্ষে ভগবানের শক্তি ও ভালবাসার অন্ত নাই। আমি পাপী, আমার হয়ত কোন উপায় হবে না, এ আর এক প্রকারের অবিশ্বাস। ভক্তি ও অবিশ্বাস কখনও একত্র থাকিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষার ন্যায় অবিশ্বাসও ভক্তিপথের প্রবল শত্রু। এই অবিশ্বাস পরিহারের জন্যও প্রার্থনা করা আবশ্যক। কেবল শক্তি ভিক্ষার জন্যই যে প্রার্থনার প্রয়োজন তাহা নয়, স্বার্থসাধন ভিন্ন সকল কার্য্যেই প্রার্থনা ভক্তির অঙ্গস্বরূপ। প্রেমিক সাধক ভগবৎকৃপা উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। সাধক একবার মাত্র বা অল্পক্ষণের জন্য বিদ্যুতের মত ভগবদুপলব্ধি করিয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলেন? দয়াময়! তুমি কোথায় গেলে, আর একবার প্রাণভরে তোমাকে দেখি, "একবার অনিমেষে তোমাকে দেখি।"

সাধক দর্শনাভিলাষে কাঁদিয়া বলিলেন ঃ—

"হেদে গো গোকুলপ্রাণ, জীবন ধন শ্যাম
একবার দরশন দিয়া রাখ প্রাণ"।

বারেক উপলব্ধিতে সাধক তুষ্ট নন, তিনি তাহার প্রাণের প্রাণ ভগবানকে নিরন্তর ধারণা করিতে চান। তাই তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন "মাগো! একবার এস, দেখা দাও মা।" স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পাইলেও ভক্ত নিমেষের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই যশোদাদেবী চক্ষের পাতাকে অন্তরায় মনে করিতেন। স্বরূপ উপলব্ধি বাসনায় প্রার্থনাও ভক্তের চির জীবনের সঙ্গী। ভক্তের ভগবান সে প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। ভগবানকে "কাতর হোয়ে ডাকলে

পরে রহিতে পারেন কই", আর এক প্রার্থনা নিষ্কাম ভক্তের ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি। তাহার নাম প্রেমপ্রার্থনা। ভক্ত ভগবানকে প্রাণ দিয়া সেবা করিতে চায়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে চায়, কিন্তু যখন তিনি কার্য্যগতিকে কিংবা অসামর্থ্য বশতঃ অক্ষম হন তখন তিনি কাঁদিয়া ভগবানকে বলেন, দেব! আমি তোমার সেবা কিছুই করিতে পারিতেছি না, আমি অতি দীন, যাহাতে আমি তোমার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি,যাহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তোমার সেবা করিতে পারি এমন উপায় তুমি করিয়া দাও"। প্রাণের ভিতর হইতে কাতর ভাবে এই প্রকার প্রার্থনা করিলে ভগবান সে প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ করেন না। বৈষ্ণবভক্ত নরোত্তমদাস তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থে প্রার্থনা করিলেন।

লীলারস সদা গান যুগল কিশোর প্রাণ
প্রার্থনা করিব অভিলাষ।
জীবনে মরণে এই আর কিছু নাহি চাই
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

ভক্ত তাই বলেন—

ভবদ্ভক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যম্।
কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থোঽস্মিতস্মাৎ॥

এই প্রেমভক্তি ভগবান না দিলে কেহ পাইতে পারেন না।

নিষ্কাম ভাবে প্রাণের সহিত কাতর ভাবে শক্তির জন্য বা স্বরূপোপলব্ধির জন্য বা সেবার জন্য বা সেবা করিবার অধিকার বা উপযুক্ত ক্ষমতা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এই প্রার্থনায় মূলে বিশ্বাস থাকা চাই। আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবেই, যেহেতু

ভগবান দয়াময়, এই বিশ্বাস হৃদয় মধ্যে রাখিয়া প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। বিশ্বাস ও প্রার্থনার উপর ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তিসাধন ও উপাসনাই মানবজীবনের সাধ্য।

ভক্তিসাধক বলেন, ভগবন্! তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ কর নাই, আমি যেন তোমাকে কখনও পরিত্যাগ না করি। আমার যেমন অবস্থা হউক্ না কেন আমার হৃদয় হইতে আমি যেন তোমাকে দূরে না রাখি।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।